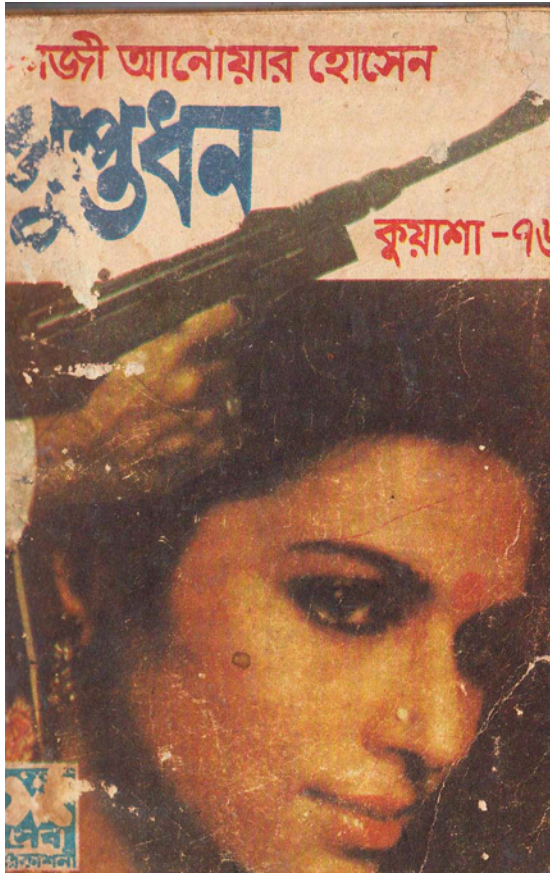
জী আনোয়ার হোসেন
প্তধন
কুয়াশা -৭৬

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

GUPTADHAN
KUASHA-76
by Qazi Anwar Husain

গুপ্তধন

কুয়াশা-৭৬

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা
প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

শান্ত ভারত মহাসাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে 'ফ্লাইং ডাক'। নীল সাগরের বিশাল ব্যাপ্তির মাঝে ছোট্ট একটা বিন্দুর চেয়েও ছোট মনে হচ্ছে জাহাজটাকে। সূর্য ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগে। রাতের আঁধার ক্রমে গাঢ় হয়ে নেমে আসছে সমুদ্রের ওপর। 'ফ্লাইং ডাক'-এর ফার্স্ট ক্লাস স্যালুন-এ জড়ো হয়েছে কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক। এক জোড়া পোকার খেলোয়াড়ের লড়াই দেখছে তারা।

ছোট্ট একটা টেবিলে মুখোমুখি বসেছে দুই খেলোয়াড়। একজন বেঁটে, কালো; মাথায় কালো কোঁকড়া চুল, নাকের নিচে সুন্দর করে ছাঁটা এক চিলতে গোঁফ। লোকটা সিংহলী। হালকা ছাই রঙের স্যুট পরে আছে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে কামড়ে ধরেছে উপরের ঠোঁট। তাস বাঁটার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। প্রতিপক্ষ লোকটা ইউরোপীয়। খুব ভালো স্বাস্থ্য, চৌকো কর্কশ মুখ, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট। নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে সিংহলী লোকটার তাস বাঁটা দেখছে সে।

বাঁটা হলো তাস—তিন আর তিন, দুই আর দুই। দু'জনেই তাস তুললো। নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল কয়েকটা সেকেণ্ড। সিংহলী

লোকটাই প্রথমে তাকালো প্রতিপক্ষের দিকে। মাথা নাড়লো ইউরোপীয়।

'নো কার্ড, আই উইল স্টে।'

ঠোঁট কামড়ালো সিংহলী। একটু ইতস্তত করে দুটো তাস রাখলো টেবিলে, নিজে নিলো আরো দুটো। নতুন তাস দুটোর দিকে এক পলক তাকিয়ে একটু সামনে ঝুঁকলো ইউরোপীয়। কিছু না বলে সামনের নোটের স্তূপ থেকে দশটা এক পাউণ্ডের নোট নিয়ে এগিয়ে দিলো সিংহলীর দিকে। নিঃসন্দেহে খুব উঁচু স্টেকে খেলা হচ্ছে। কারণ, দেখা গেল বাজির অংক দেখে একটুও অবাক হলো না সিংহলী। দ্রুত একবার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ওয়ালেট থেকে দুটো দশ পাউণ্ডের নোট বের করে রাখলো ইউরোপীয়ের এগিয়ে দেয়া নোটগুলোর ওপর।

'আরো দশ বেশি,' শান্ত গলায় বললো সে।

কাঁধ ঝাঁকালো ইউরোপীয়। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও করছে এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে দিলো আরো দশটা নোট।

'খুব ভালো তাস পেয়েছো মনে হচ্ছে এবার।'

মৃদু হাসলো সিংহলী। কোনো সন্দেহ নেই, এবার সে জিতছে। ধীরে ধীরে, আস্তিনের ভেতর থেকে আস্ত একটা হাতি বের করছে এমন ভঙ্গিতে হাতের তাসগুলো দেখালো লোকটা।

'চার বিবি।'

টেবিলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে চল্লিশ পাউণ্ড টেনে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো সে।

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে।' শক্ত বিরাট একটা হাত চেপে ধরলো তার কব্জি। 'দুঃখিত, এবারও তোমাকে নিরাশ করতে হচ্ছে।

সন্দেহ নেই খুবই ভালো তাস পেয়েছো, কিন্তু জিততে পারোনি। এই দেখ, আমি কি পেয়েছি—চার টেক্কা।'

তাসগুলো একটার পর একটা উল্টে দিলো সে: রুইতনের ছয়, চিড়েতনের টেক্কা, হরতনের টেক্কা, ইস্কাপনের টেক্কা এবং সব শেষে রুইতনের টেক্কা। নিশ্বাস গলার কাছে আটকে গেল সিংহলীর। রং বদলে গেছে মুখের।

'যথেষ্ট হয়েছে, আর না!' বললো সে। 'আর হারার সামর্থ্য নেই আমার।' সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। দর্শকরা সহানুভূতির সাথে বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দিলো তাকে। 'অন্য কেউ বসতে পারেন আমার জায়গায়। মিস্টার ফ্যারেলের ভাগ্যের সাথে টেক্কা দেয়া আমার কম্ম নয়।'

স্যালুন ছেড়ে চলে গেল সে। আর ফ্যারেল হেসে টাকার স্তূপটা টেনে নিলো নিজের দিকে। তারপর তাকালো দর্শকদের দিকে। ভাষণ দেয়ার ভঙ্গিতে শুরু করলো, 'আর কেউ খেলতে চান আমার সাথে?' পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরালো সে। 'যে কেউ, যে কোনো অঙ্কের বাজি ধরুন না কেন, আমি রাজি। কে আসছেন?'

কেউ এগিয়ে এলো না। দু-চার পয়সা বাজি ধরে মাঝে মধ্যে শখ করে খেলা এক জিনিস আর পাঁচ-দশ পাউণ্ড বাজি ধরে এমন এক পোকার খেলোয়াড়ের সাথে খেলা অন্য জিনিস।

আবার হাসলো ফ্যারেল।

'এক জনেরও সাহস নেই! টাকা হারানোর ভয়ে অস্থির সবাই! আরে, এত ভয়ের কি আছে? ভাগ্য কি কারো সাথে বাঁধা থাকে? এতক্ষণ আমি জিতেছি, এবার হয়তো আপনি জিতবেন।'

এবারও কেউ এগোলো না। কাঁধ ঝাঁকালো ফ্যারেল।

'বেশ, আপনারা সবাই যদি ভীতুর ডিম হন, আমার কি করার আছে?'

টাকাগুলো গুছিয়ে ওঠাতে লাগলো সে। এমন সময় হঠাৎ তার চোখ গেল ভীড়ের পেছনে একটা মুখের দিকে। সবগুলো লোকের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে তার মাথা। লোকটার চেহারায় এমন এক দৃঢ়তা যে, দেখলেই মনে হয় ঝুঁকি নেয়ার জন্যে তৈরি সব সময়।

'এই যে! আপনি!' ডাকলো ফ্যারেল।

টুইডের স্পোর্টস জ্যাকেট আর ধূসর ট্রাউজার পরা এক লোক এগিয়ে এলো। চেহারা দেখে এশীয়-ই মনে হয়। সত্যিই একটা শরীর বটে লোকটার! যেমন লম্বা তেমন চওড়া। অদ্ভুত সুন্দর দুটো চোখ। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। চোখের দিকে চাইলে মনে হয় কত গভীর যেন মানুষটা, যেন সাগর। কত কি তার অতল তলে লুকিয়ে আছে! শীতল দৃষ্টি মেলে ফ্যারেলের দিকে তাকালো সে।

'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে! আসুন না, এক হাত হয়ে যাক, তাসে আপনার ভাগ্য কেমন দেখি।'

মাথা নাড়লো লোকটা।

'না, ধন্যবাদ। সময় কাটানোর বা টাকা খরচ করার আরো ভালো উপায় জানা আছে আমার। বেচারার শেষ কপর্দকটা পর্যন্ত পকেটে পুরেছেন, তাতেও কি তৃপ্তি হয়নি আপনার?'

দাঁত বের করে হাসলো ফ্যারেল।

'এখন আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি, পারলে আমার শেষ কপর্দক-টাও হাতিয়ে নিন। কি রাজি?'

'না, আমি তাস খেলি না।'

'অর্থাৎ এদের মতো আপনিও ভয় পেয়েছেন।' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ফ্যারেলের ঠোঁট। 'দুঃখিত, আমি ভুল বুঝে-ছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় এই ছাপোষা মানুষগুলোর চেয়ে আলাদা। আপনার চেহারা দেখে কেন জানি মনে হয়ে-ছিলো, মাঝে মধ্যে একটু আধটু ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন আপনি।' বিরক্তির সঙ্গে চুরুটটা অ্যাশট্রেতে ঠেসে ধরে নিভিয়ে ফেললো সে। 'এখন দেখছি, আপনিও আর সবার মতো ভীতুর ডিম!'

মৃদু একটা গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের ভেতর। টুইডের স্পোর্টস জ্যাকেট পরা লম্বা চওড়া লোকটার ভুরু উঁচু হলো একটু। ভীষণ বিরক্ত হয়েছে সে। সারা বিকেল জিতে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে জুয়াড়ীটা। কষে একটা চড় লাগালে ব্যাটার পিত্তি জ্বালানো কথার উচিত জবাব দেয়া হয়। কিন্তু তেমন কিছু করলো না লোকটা। ধীর পায়ে টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'মিস্টার ফ্যারেল, মত বদলেছি। খেলবো আমি।'

'সিংহলী লোকটার খালি চেয়ারে বসে পড়লো সে। সবজান্তার হাসি ফুটে উঠলো ফ্যারেলের মুখে।

'জানতাম, আপনি খেলবেন,' বললো সে। 'মানুষ চিনতে ভুল করি না আমি!'

'না, কিন্তু ইনি বোধহয় করছেন!' টেবিলের কাছে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে হাত রাখলো লম্বা-চওড়া লোকটার কাঁধে! 'বোকামি করবেন না। ওর ফাঁদে পা দিচ্ছেন আপনি।'

'এই, তুমি নাক গলাবার কে ?' ঝামটে উঠলো ফ্যারেল। 'নিজের ভালো মন্দ বোঝার মতো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে ওর।'

'তোমার মতো লোককে জাহাজে উঠতে দেয়াই উচিত হয়নি। লোভী বদমাশ কোথাকার !'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো ফ্যারেল। এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে বৃদ্ধের ওপর। কিন্তু তাকে সে সুযোগ দিলো না স্পোর্টস জ্যাকেট পরা লোকটা। ধরে বসিয়ে দিলো চেয়ারে। কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠেছে তার চোখে।

'খেলা শুরু হোক তাহলে, মিস্টার ফ্যারেল ?'

'আঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, মিস্টার—।'

'মনসুর আলী। বাঁটবে কে ? আপনি না আমি ?'

বিগলিত একটা ভঙ্গি করলো ফ্যারেল। 'আপনিই বাঁটুন।'

আনাড়ীর মতো তাসগুলো ফেটলো মনসুর আলী। তারপর বাঁটলো, আরো আনাড়ী ভঙ্গিতে, যেন প্রতিপক্ষের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়, নেহায়েত এক নবিশের সাথে খেলছে সে।

শুরু হলো খেলা। সত্যি কথা বলতে কি, তাস জিনিসটা কখনোই বিশেষ আকর্ষণ করে না মনসুর আলীকে, তাই বলে সে যে একেবারে আনাড়ী তাস খেলায় তা-ও কিন্তু নয়। সুতরাং আনাড়ীপনার ভান করলেও দিব্যি খেলে যেতে লাগলো সে। পোকার সম্পর্কে যেটুকু বিদ্যা আয়ত্তে আছে সবটুকু তো প্রয়োগ করছেই, সেই সাথে আর যা করছে তা হলো মাথা ঠাণ্ডা রাখছে আর সামান্য মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান খাটাচ্ছে। যখন বুঝতে পারছে ফ্যারেলের হাত ভালো, তখন টাকার অঙ্ক খুব একটা চড়াচ্ছে না, যখন বুঝতে পারছে দুজনের হাত মোটামুটি সমান তখন জোর গলায় রীতিমতো

বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে ভাঁওতা দিয়ে যাচ্ছে—সে ফাঁদে মাঝে মাঝে পড়ছেও ফ্যারেল। আর যখন বুঝতে পারছে নিজের হাত ভালো তখন চড়িয়ে দিচ্ছে বাজির অঙ্ক।

কৌশলটা যে কাজে লাগছে তা বলা বাহুল্য। আধ ঘণ্টার ভেতর দেখা গেল ফ্যারেলের সামনে নোটের স্তূপটা বেশ ছোট হয়ে এসেছে পাশাপাশি বড় হয়েছে মনসুর আলীর স্তূপটা।

ফ্যারেল সত্যিই আনাড়ী ভেবে নিয়েছিলো প্রতিপক্ষকে, সেই সাথে একটু আগের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে বেপরোয়াভাবে খেলেছে, ফলে প্রায় প্রতিবারই হেরেছে। যখন সে বুঝতে পারলো যতটা ভাবছে ততটা আনাড়ী নয় প্রতিপক্ষ, ততক্ষণে তার অর্ধেক টাকা জিতে নিয়েছে মনসুর আলী। খেলোয়াড় হিসেবে ফ্যারেল মনসুর আলীর চেয়ে অনেক ভালো, তবে এক দিক থেকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে মনসুর আলী; তা হলো, কোনো পরিস্থিতিতেই ধৈর্যচ্যুতি হয় না তার। অন্য দিকে দু'তিনবার হারার পরই অস্থির হয়ে উঠলো ফ্যারেল। লাল হয়ে উঠলো শাদা মুখটা। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিতে শুরু করেছে কপালে।

এদিকে একের পর এক ভালো তাস পেয়ে চলেছে মনসুর আলী। প্রায় প্রতি দানেই চারটে করে গোলাম, সাহেব বা টেক্কা পাচ্ছে। শান্ত নিরুদ্বেগ মুখে খেলে চলেছে সে। অন্য কোনো দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। দাম্ভিক জুয়াড়ীটাকে পুরোপুরি ফতুর করে তবে ছাড়বে।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখা গেল, মাত্র আটটা এক পাউণ্ডের নোট অবশিষ্ট আছে ফ্যারেলের টাকার স্তূপে। মনসুর আলীর বাঁটা এবার। একটা তাস বদলালো ফ্যারেল। মনসুর আলী নিলো

আরো দুটো। ফলে তার হাতে হলো এক জোড়া সাত, এক জোড়া তিন আর একটা অন্য তাস—খুব একটা ভালো হাত নয়। তবু ফ্যারেল যখন তিনটে এক পাউণ্ড নোট এগিয়ে দিলো সে সঙ্গে সঙ্গে বাজির অঙ্ক বাড়িয়ে পাঁচ পাউণ্ড করলো।

'আরো তিন বাড়াচ্ছি আমি,' ভাবলেশহীন গলায় বললো ফ্যারেল।

শেষ তিনটে নোট-ও এগিয়ে দিলো সে। একটু থমকালো মনসুর আলী—ভাঁওতা না তো? তার নিজের হাত খুব ভালো নয়, তবু একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখতে চাইলো সে। তিনটে এক পাউণ্ডের নোট এগিয়ে দিলো সামনে।

ভদ্রতার মুখোশ খুলে গেল ফ্যারেলের মুখ থেকে।

'এবার তোমাকে দেখে নেবো,' দাঁতে দাঁত ঘষে বললো সে। তারপর উল্টে দিলো নিজের তাসগুলো। 'এক জোড়া সাহেব।'

'দুটো জোড়া আমার হাতে,' শান্ত গলায় বললো মনসুর আলী। টাকাগুলো টেনে নিতে নিতে প্রশ্নবোধক চোখে তাকালো সে ফ্যারেলের দিকে। 'কি, আরো চলবে, না যথেষ্ট হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকালো ফ্যারেল।

'সারা রাত চালাতেও কোনো আপত্তি নেই আমার। তবে কথা হলো গিয়ে, এ মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি ছাড়া উপায় নেই…'দেখতেই পাচ্ছো, আমার গোলা বারুদ সব শেষ।'

হালকা চালে কথাটা বলার চেষ্টা করলো ফ্যারেল, তবে মনসুর আলী এবং দর্শকরা সবাই দেখলো, রুমাল দিয়ে ঘাড় কপাল মুছছে বেচারা।

টাকাগুলো গোছাতে গোছাতে হঠাৎ করেই থেমে গেল মনসুর

আলী। এই জঘন্য লোকটার আরো জঘন্য উপায়ে অর্জিত টাকা নেয়ার কথা ভাবতেই গা ঘিন ঘিন করে উঠলো তার।

'মিস্টার ফ্যারেল,' হঠাৎ বলে উঠলো সে, 'খোয়ানো টাকা-গুলো ফিরে পাওয়ার সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে তুমি?'

'অবশ্যই!' কপাল মুছতে মুছতে জোরের সাথে বললো লোক-টা। 'তবে তা যে সম্ভব নয় তা তুমি ভালোই জানো। আমার পকেটে আর একটা পেনি-ও নেই।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। ইচ্ছা মতো একটা করে তাস টানবো আমরা, যে বড় পাবে সে-ই জিতবে। জিতলে সব টাকা ফেরত পাবে তুমি।'

'আর যদি হারি?'

'সে সম্ভাবনা তো আছেই। তবু ভেবে দেখ সুযোগটা নেবে কিনা।'

'সবার সামনে যদি ঘোষণা করি আমি তোমার কাছে ঋণী, তাহলে চলবে?'

'আঁ, হ্যাঁ, চলতে পারে।'

তবু ইতস্তত করছে ফ্যারেল। দর্শকরা ফিসফিস করে আলাপ করছে নিজেদের ভেতর। উত্তেজনায় টগবগ করছে তারা।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললো ফ্যারেল। 'খেলবো আমি। দেখি চেষ্টা করে, হারানো সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা।'

ফেটে তাসগুলো ফ্যারেলের দিকে এগিয়ে দিলো মনসুর আলী।

'আগে তুমি।'

সাবধানে পুরো প্যাকেট থেকে একটা তাস বাছাই করলো

ফ্যারেল। এক পলক তাকিয়েই তাসটা উপুড় করে রেখে দিলো সে। শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে দর্শকরা। এবার মনসুর আলীর পালা। সাবধানে, অন্য কেউ যেন দেখতে না পায় এমন ভাবে একটা তাস বের করে আনলো সে। চকিতে একবার দেখেই রেখে দিলো উপুড় করে।

'মিস্টার ফ্যারেল, কি খবর ?'

চেপে রাখা দম ছাড়তে ছাড়তে তাসটা উল্টালো ফ্যারেল। 'হার্টস-এর জ্যাক—'

আনমনা ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো মনসুর আলী। তারপর উপুড় করা অবস্থায়ই নিজের তাসটা ঠেলে দিলো সামনে।

'তুমিই জিতেছো,' বললো সে। 'মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত হারানো সৌভাগ্য ফিরে পেয়েছো তুমি···নিয়ে নাও তোমার টাকা।'

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকাগুলো পকেটে পুরলো ফ্যারেল, তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে। আর দর্শকরা আড়চোখে সবিস্ময়ে দেখছে মনসুর আলীকে। ঘণ্টা খানেকেরও কম সময়ের ভেতর লোকটা এতগুলো টাকা জিতলো, অথচ শেষ মুহূর্তে মাত্র একটা তাসের কারণে হারালো সব !

দু-হাতের দশ আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর তবলা বাজালো মনসুর আলী, তারপর বেরিয়ে গেল স্যালুন ছেড়ে। যাওয়ার আগে দর্শকদের উপহার দিয়ে গেল অপূর্ব এক টুকরো হাসি।

দর্শকদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ এবং

কৌতূহলের সাথে খেলা দেখছিলো একটি মেয়ে। বাইশ তেইশ বছর হবে বয়স। অপূর্ব সুন্দরী। ছিপছিপে শরীর, টানা টানা চোখ। টিকালো নাক, মাথায় কালো চুল, গায়ের রং টকটকে ফর্সা, অনেকটা ইউরোপীয়দের মতো।

মনসুর আলী বেরিয়ে যেতেই তাসের টেবিলটার দিকে এগিয়ে এলো সে। দ্রুত হাতে তুলে নিলো মনসুর আলীর উপুড় করে রেখে যাওয়া তাসটা। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। ইস্কাপনের সাহেব! জুয়াড়ীটা পেয়েছিলো হরতনের গোলাম। তার মানে মনসুর আলী নামক লোকটা ইচ্ছে করেই হারার ভান করেছে এবং টাকাগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে ফ্যারেলকে।

'কিন্তু কেন?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো মেয়েটা। 'কেন হারার ভান করলো ও? যদি না—যদি না—,' মনসুর আলী যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সেই দরজার দিকে তাকালো সে; তারপর আপন মনেই মাথা নাড়লো একটু। 'আশ্চর্য! এ রহস্য ভেদ করতেই হবে আমাকে।'

ইস্কাপনের সাহেবটা হাতব্যাগে চালান করে দিয়ে স্যালুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে-ও।

দুই

ইংল্যাণ্ডে এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন শেষে দেশে ফিরছে কুয়াশা। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা অংশ নিয়েছেন সেই সম্মেলনে। বাংলাদেশ থেকে সরকারীভাবে কোনো প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি, তবে বেসরকারী পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে তাতে যোগ দিয়েছিলো কুয়াশা। সম্মেলন শেষ হওয়ার পর হঠাৎ করেই কয়েক দিনের জন্যে জীবন থেকে ছুটি নেয়ার ইচ্ছে হয় ওর। কোনো কারণ নেই, নিছক একটু বিশ্রাম নেয়া। প্লেনের টিকিট ফেরত দিয়ে জাহাজে চেপে বসে ও। জাহাজে কলম্বো পর্যন্ত গিয়ে প্লেনে বোম্বে হয়ে ঢাকায় চলে যাবে।

বেশ কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। রোজ ভোরে জাহাজের সামনে চলে যায় কুয়াশা। সূর্যোদয় দেখে। দিগন্ত রাঙিয়ে একটু একটু করে সাগরের তল থেকে উঠে আসে সূর্য। প্রতিদিন একই রকম, তবু তৃপ্তি হয় না কুয়াশার। প্রতিদিন ভোর হতেই কিসের এক অমোঘ আকর্ষণে যেন চলে যায় সামনে। দিনের বেলায় বইপত্র পড়া,

স্যালুনে টুকটাক খেলাধূলা—টেবিল টেনিস বা দাবা, আর ডেকে বসে বসে নীল সমুদ্রের বিশাল বিস্তৃতি দেখা। মনের পর্দায় তখন ভীড় করে আসে কত মুখ—বাবা হেকমত আলী, মহুয়া, শহীদ, কামাল, সেই মিসরীয় সুন্দরী দীবা ফারাহ্, গোগী, ডঃ কোট-যে···। সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া শেষে কেবিনে ফিরে সরোদটা নিয়ে বসে। অন্য এক জগতে হারিয়ে যায় কুয়াশা। জুয়াড়ীটাকে এক হাত নিতে পেরে বেশ কিছুদিন পর আজ একটু উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে ও।

ডিনারের সময় না হওয়া পর্যন্ত কেবিনে রইলো কুয়াশা ওরফে মনসুর আলী। তারপর স্নান করে নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরে নেমে এলো ডাইনিং রুমে। খাওয়ার ঘরে ঢুকতেই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল ওর। প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট টেবিলটায় বসে খায় ও, সেটায় আজ বসে আছে অন্য একজন—অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে। ছিপছিপে শরীর, টানা টানা কালো এক জোড়া চোখ, টিকালো নাক, টকটকে ফর্সা গায়ের রং—অনেকটা ইউরোপীয়দের মতো; কিন্তু চেহারা দেখে কিছুতেই মেয়েটাকে ইউরোপীয় বলে মনে হয় না।

মেয়েটা কে, কোনো ধারণা নেই ওর। সন্ধ্যায় স্যালুনে দেখে-ছিলো, আগেও দু-একবার দেখেছে—ডেকে নয় তো স্যালুনে নয় তো ডাইনিং রুমে; কখনো আলাপ হয়নি। মেয়েটা কি একা ভ্রমণ করছে না সঙ্গে কেউ আছে? ভাবতে ভাবতে এগোলো কুয়াশা টেবিলের দিকে। এমন সময় স্টুয়ার্ড এগিয়ে এলো ওর কাছে।

'মিস্টার আলী!' বললো সে 'ঐ ভদ্রমহিলা আজ আপনার

টেবিলে খাবেন, আশা করি কিছু মনে করবেন না। সাধারণত উনি প্রথম সার্ভিসেই খেয়ে নেন। কেন জানি না, আজ এখন এসেছেন। অন্য কোনো টেবিলে জায়গা না পেয়ে আপনার টেবিলেই বসিয়েছি। আশা করি……।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধা হবে না,' একটু হেসে লোকটাকে থামিয়ে দিলো কুয়াশা।

টেবিলের কাছে পৌঁছে স্টুয়ার্ড পরিচয় করিয়ে দিলো, 'ইনি মিস্টার মনসুর আলী, নাম করা বিজ্ঞানী আর…।'

'আমার পরিচয় আমি নিজেই দিচ্ছি, বাধা দিয়ে বললো মেয়েটা, 'আমি মিলা—মিলা নোভাক।'

সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে মেয়েটার ছোট্ট নরম হাত তুলে নিলো কুয়াশা নিজের বিশাল হাতে। একটু নেড়ে ছেড়ে দিলো। মিষ্টি করে হাসলো মেয়েটা। তার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসলো কুয়াশা। স্টুয়ার্ড চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দু' জন। অবশেষে নীরবতা ভাঙলো মেয়েটা।

'সন্ধ্যায় আপনার পোকার খেলা দেখছিলাম ··চমৎকার খেলেছেন আপনি।'

'দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, পোকারে আমার অভিজ্ঞতা সামান্যই। যেটুকু খেলতে পেরেছি ভালো খেলি বলে নয়, ভালো তাস পেয়েছি বলেই পেরেছি।'

''সত্যিই !?' একটু ঝুঁকে এলো মেয়েটা। 'তাহলে তো খুবই সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আপনি! এত চড়া বাজিতে খেলছিলেন।'

'মানুষের মাথায় কখন কি ঝোঁক চাপে কিছু ঠিক আছে?

ঝোঁক চাপলো খেলতে রাজি হয়ে গেলাম।'

'হ্যাঁ, তেমনি ঝোঁকের মাথায় টাকাগুলো ফেরত-ও দিয়ে দিলেন!'

কাঁধ ঝাঁকালো কুয়াশা।

'লোকটার দুরবস্থা দেখে মায়া হলো, একটা সুযোগ দিলাম। ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি চান্স ছিলো আমার···কিন্তু ও-ই জিতলো, শেষ-মুহূর্তে ভাগ্য বিশ্বাসঘাতকতা করলো আমার সাথে।'

অবাক চোখে কিছুক্ষণ কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটা। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'মাফ করবেন, মিস্টার আলী, হয়তো একটু বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলছি, কিন্তু না দেখিয়েও পারছি না—আপনি কি অনেকদিন ধরে চেনেন উইলিয়াম ফ্যারেলকে?'

'না না। কেন? ওকে কি আমার পরিচিতের মতো লাগছিলো?'

'আপনার পরিচিতরা কেমন জানি না, মিস্টার আলী।'

'অন্তত উইলিয়াম ফ্যারেলের মতো যে নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর অনেকদিন ধরে চিনি কি না?—সত্যি কথা বলতে কি, আজ বিকেলের আগে অমন কোনো লোক যে দুনিয়ায় আছে তা-ই জানতাম না।'

'বুঝতে পারছি—অন্তত—' চোখ বড় বড় করে একটু হাসলো মেয়েটা। 'না, কিছুই বুঝতে পারছি না!'

এবার হাসলো কুয়াশা-ও। 'কি বুঝতে পারছেন না?'

'বুঝতে পারছি না, বন্ধু বা পরিচিত কেউই যদি না হবে, উইলিয়াম ফ্যারেলকে টাকাগুলো ফেরত দিলেন কেন আপনি?'

'ফেরত দেবো কেন,' প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললো কুয়াশা।

'শেষ দানে ও জিতেছে তাই ফেরত পেয়ে গেছে টাকাগুলো।'

'কিন্তু, আপনি তো হারেননি। ও টেনেছিল গোলাম আর আপনি টেনেছিলেন সাহেব।'

নির্ভেজাল বিস্ময়ের ভাবটা লুকোতে পারলো না কুয়াশা।

'আপনি কি করে জানলেন? নিশ্চয়ই স্পাইং করছিলেন আমার ওপর!'

হাসলো মেয়েটা।

'তা বলতে পারেন। কিন্তু কি করবো, আপনি এমনভাবে আমার কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছিলেন! শেষ দানে অমন করে আপনার হেরে যাওয়াটা স্বাভাবিক মনে হয়নি আমার। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পর টেবিলের কাছে গিয়ে আপনার তাসটা দেখলাম···।'

'নিশ্চয়ই অন্য কোনো তাস দেখেছিলেন,' দৃঢ় গলায় বললো কুয়াশা।

'উঁহুঁ। যেটা আপনি উপুড় করে রেখে এসেছিলেন, সেটাই। দেখুন—'

হাতব্যাগ খুলে একটা তাস বের করলো মেয়েটা। টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললো, 'এই যে, ইস্কাপনের সাহেব।'

'হুঁ।' তাসটা তুলে নিয়ে এক পলক দেখলো কুয়াশা। 'সে ক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে একটা ব্যাখ্যা অবশ্য আছে!'

'না না, তার কোনো দরকার নেই,' বিব্রত ভঙ্গিতে বললো মিস নোভাক। 'যত যা-ই হোক, আপনার জেতা টাকা আপনি যাকে খুশি দেবেন, আমার কি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনি কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

অবশ্য আপনার কোনো দোষ নেই তাতে।' হাসলো কুয়াশা। বুক পকেটে তাসটা ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'সত্যি কথাটা হলো, আমি জুয়াড়ী নই। জুয়া খেলা ভীষণ অপছন্দ করি। হারলে টাকা নষ্ট, জেতার ভেতরেও বিশেষ আনন্দ পাই না। অন্যের পকেট থেকে সামান্য কিছু টাকা খসিয়ে নিজের পকেটে পোরার মধ্যে আর যা-ই থাক পৌরুষ কিছু নেই।'

'তাহলে না খেললেই পারতেন। যখন খেললেনই, জেতা টাকাগুলো ফেরত দেয়া উচিত হয়নি। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার ছিলো লোকটার। আগের লোকটার শেষ কপর্দক পর্যন্ত যখন জিতে নেয় তখন কি একটুও দুঃখ বোধ করেছিলো ও?'

এ সময় খাবার দিয়ে গেল স্টুয়ার্ড।

'না,' স্বীকার করার ভঙ্গিতে বললো কুয়াশা। 'থাকগে, যা গেছে গেছে, আসুন খেয়ে নেয়া যাক।'

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো মিলা নোভাক। একটু পরেই স্যালুনে এক নাচের অনুষ্ঠান হবে। তাতে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে চলে গেল নিজের কেবিনে।

'আপনার সাথে দেখা হবে ওখানে?' যাওয়ার আগে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো সে।

'বোধহয় না। ও সব নাচ-টাচ ভালো লাগে না আমার। পারিও না। ডেকে একটু খোলা হাওয়া খেয়ে কেবিনে ঢুকে পড়বো। কাল হয়তো দেখা হবে।'

চেহারা দেখে মনে হলো, একটু যেন আশাহত হয়েছে মেয়েটা। হোকগে। স্যালুনে ঐ গুমোট আর ভীড়ের মধ্যে নর্তন কুর্দন করা তো অসম্ভব, দেখাও অসহ্য।

মিস নোভাক চলে যাওয়ার একটু পরেই ডেকে চলে এলো কুয়াশা। প্রায় অন্ধকার ডেক। বেশির ভাগ বাতি-ই নেভানো। রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ও। মেয়েটার কথা-ই ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতর: ওর সম্পর্কে এত উৎসাহী হয়ে উঠলো কেন হঠাৎ? জেতার পরেও টাকাগুলো ফেরত দিলো কেন তা নিয়ে আর কেউ তো কোনো কৌতূহল দেখায়নি, মেয়েটা দেখাচ্ছে কেন? হঠাৎ করে আজ খাবার সময়ই বা বদলালো কেন সে? নিছক কাকতালীয় ব্যাপার, না ইচ্ছে করেই ওর সাথে কথা বলার জন্যে অমন করেছে? কেনই-বা ওর সাথে কথা বলতে চাইবে মেয়েটা?

প্রশ্নগুলোর কোনো সদুত্তর পেলো না কুয়াশা। একবার ভাবলো একটু খোঁজ খবর করবে। ফ্লাইং ডাকের সেকেণ্ড অফিসার জোনাথান ওর পুরনো বন্ধু। ওকে বললেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখাবে, সম্পূর্ণ না হলেও মেয়েটার মোটামুটি একটা পরিচয় অন্তত জানা যাবে। ব্রিজে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোলো ও।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে কুয়াশা। উঠতে শুরু করবে; এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওর কানে, '...একদম পছন্দ হচ্ছে না আমার। মিলা ছুঁড়িটাকে চলো ধোলাই লাগাই একদিন, গড় গড় করে সব বলে দেবে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কুয়াশা। সিঁড়ির ওপাশে একটা লাইফ বোট রাখা তার পরেই রেলিং। রেলিং-এ ভর দিয়ে মগ্ন হয়ে আলাপ করছে দুই লোক সাগরের দিকে মুখ। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না, তবু বুঝতে পারছে কুয়াশা, ওদের কথা-ই কানে এসেছে। ব্রিজে না উঠে পা টিপে টিপে লাইফ বোটটার আড়ালে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলো ও। দ্বিতীয় একটা গলা শুনতে পেলো,

'ধৈর্য ধরো, বন্ধু, ধৈর্য ধরো!'

আগেরটার চেয়ে মোটা আর কর্কশ এ কণ্ঠস্বর। একটু যেন পরিচিত মনে হলো কুয়াশার কাছে, আগে শুনেছে এ গলা!

'যতক্ষণ ও জাহাজে আছে ততক্ষণ কিছু করতে পারবো না আমরা,' বলে চললো কর্কশ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। 'কলম্বো পৌঁছেই ওকে ধরবো। তখন আর কোনো বাধা থাকবে না।'

'দরকার হলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে,' বললো অন্য জন।

'উঁহুঁ, শক্তি প্রয়োগের দরকার হবে বলে মনে হয় না আমার। শুধু রাজেন্দ্র সিং-এর নাম উচ্চারণ করলেই হবে, ছুঁড়ি বুঝে যাবে, খেল খতম।'

'তার অর্থ এই নয়, ও সব গড় গড় করে বলে দেবে—'

'আমার ধারণা, বলবে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল কথাবার্তা। ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করলো কুয়াশা, কোথায় শুনেছে ভারি, কর্কশ গলাটা? প্রথমটা অপরিচিত, কিন্তু দ্বিতীয়টা—আবার আলাপ শুরু হতেই কান খাড়া করলো ও।

'এই মিলা মেয়েটাকে যত সোজা ভাবছো তত সোজা কিন্তু মনে হয় না আমার। আমি বলে দিচ্ছি, দেখো, ওর পেট থেকে কথা বের করা বেশ কঠিন হবে।'

'সেটা আমিও জানি,' জবাব দিলো কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'এবং সেজন্যেই শক্তি প্রয়োগের বুদ্ধিটা পছন্দ করতে পারছি না। জাহাজ থেকে নামার পর ওকে অনুসরণ করবো আমরা। আমরা যে অনুসরণ করছি তা কিছুতেই ওকে বুঝতে দেয়া চলবে না। এক সময় দেখবে ওর পেছন পেছন ঠিকই জায়গামতো পৌঁছে গেছি।'

'কিন্তু যদি ও টের পেয়ে যায়, আমরা অনুসরণ করছি, তারপর কোনো ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে পালায় ?'

'নিজেকে আমি অত অযোগ্য ভাবি না। সেদিনের ছুঁড়ি, আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে, অসম্ভব !'

'স্বীকার করছি অসম্ভব, কিন্তু অনেক অসম্ভবই কোনো কোনো সময় সম্ভব হয়ে যায়। তার চেয়ে এক কাজ করতে পারি আমরা, ওর আগেই ফালিতে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি !'

'উঁহুঁ, ঠিক কোথায় আছে মুকুটটা জানার আগে কিছুতেই ওকে চোখের আড়াল করা যাবে না।' তাছাড়া এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। আপাতত মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখা-ই আমাদের কাজ। পরবর্তী করণীয় কি তা জানাবে লিন। কলম্বো পৌঁছেই ওর কাছে রিপোর্ট করতে হবে।'

আর বসে থাকার প্রয়োজন বোধ করলো না কুয়াশা। গলাটা চিনতে পেরেছে। বিকেলে এ লোকের সাথেই পোকার খেলেছে সে—উইলিয়াম ফ্যারেল। যেমন নিঃশব্দে গিয়ে বসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে সরে এলো ও লাইফ বোটের আড়াল থেকে।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটার সাথে আলাপ করতে হবে আরেকবার,' আপন মনে বললো কুয়াশা। 'উইলিয়াম ফ্যারেল সম্পর্কে সাবধান করতে হবে ওকে। জোনাথানের কাছে পরে গেলেও চলবে।' স্যালুনের দিকে এগোলো ও।

একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে কুয়াশা, এই ফ্যারেল লোকটা কোনো না কোনো ভাবে জড়িত মিস নোভাকের সঙ্গে। এবং সেটা যে শুভ উদ্দেশ্যে নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কুয়াশা যখন স্যালুনে পৌঁছুলো তখন পুরোদমে চলছে নাচ।

কোণার একটা টেবিলে আরো কয়েক জন যাত্রীর সঙ্গে বসে আছে মিলা। জোড়ায় জোড়ায় নাচছে নারী-পুরুষ। তাদের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোলো কুয়াশা।

'মিস্টার মনসুর আলী!' দুষ্টুমিভরা হাসি নিয়ে মুখ তুললো মেয়েটা। 'অবশেষে এসব নাচটাচের ভেতর মজা খুঁজে পেলেন তাহলে!'

'ঠিক তা নয়,' বললো কুয়াশা। 'তোমার সাথে নাচবো বলেই শুধু এলাম।'

খানিকটা ঠাট্টার ছলে, খানিকটা গুরুত্ব দিয়ে ও বললো কথাটা, কিন্তু মেয়েটা নিলো পুরোপুরি গুরুত্বের সাথে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো সে। কুয়াশার হাত ধরে এগোলো নাচের জায়গার দিকে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নাচলো ওরা। অবশেষে ঘাড় উঁচু করে তাকালো মিস নোভাক কুয়াশার মুখের দিকে। ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে গেল তার।

'কাউকে আশা করছেন নাকি, মিস্টার আলী?'

দ্রুত দরজার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনলো কুয়াশা। 'অ্যাঁ?' তারপর একটু হেসে যোগ করলো, 'না না, কাকে আর আশা করবো? এ জাহাজে আমার পরিচিত কেউ থাকলে তো?'

দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলো কুয়াশা কারণ সত্যি সত্যিই ও আশা করছিলো সঙ্গীর সাথে আলাপ শেষে স্যালুনে আসবে উইলিয়াম ফ্যারেল। কিন্তু মনে হচ্ছে, এখনো ওদের বিতর্ক শেষ হয়নি।

আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নাচলো ওরা। এর ভেতর বার

দুয়েক আড়চোখে দরজার দিকে তাকালো কুয়াশা, চোখ এড়ালো না মিলার। আস্তে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলো সে। তার-পর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো, 'মিস্টার আলী, একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে আপনাকে। কিছু হয়েছে নাকি?'

জবাব দেয়ার আগে এক মুহূর্ত সময় নিলো কুয়াশা।

'ডেকে দুই লোকের আলাপ কানে এসেছে আমার,' নিচু গলায় বললো ও।

'হ্যাঁ?' প্রশ্ন মিলার চোখে। 'কাদের, কি কথা কানে এসেছে?'

'বলছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? ডিনারের সময় আমাকেই তুমি প্রশ্নটা করেছিলে।'

'কি প্রশ্ন?'

'উইলিয়াম ফ্যারেল লোকটা কি তোমার পূর্ব পরিচিত?'

স্পষ্ট অনুভব করলো কুয়াশা, ওর দুবাহুর ভেতর শক্ত হয়ে গেল মেয়েটা।

'কেন—একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'অবশ্যই জবাবটা জানতে চাই বলে।'

'আঁ, হ্যাঁ—আমি, হ্যাঁ শুনেছি ওর কথা। আলাপ পরিচয় নেই, নামটা শুধু জানি আর চেহারায় চিনি।'

'ও জানে সেকথা?'

'আমি—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু কেন? কেন জানতে চাইছেন এ কথা?'

'আমার ধারণা ও তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।'

স্পষ্ট ভয়ের ছাপ পড়তে দেখলো কুয়াশা মেয়েটার মুখে।

'কি ক্ষতি?'

নিচু গলায় বলে গেল কুয়াশা, লাইফ বোটের আড়ালে বসে ফ্যারেল আর তার সঙ্গীর আলাপ যা যা শুনেছে সব। অনুভব করলো, শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করেছে মেয়েটা। ঠিক তালে নাচতে পারছে না।

'আমরা কি ডেকে গিয়ে আলাপ করবো?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'হ্যাঁ।'

মিলার হাত ধরে স্যালুন ছেড়ে বেরিয়ে এলো কুয়াশা।

তিন

'এমন কিছু যে ঘটবে, আমি জানতাম,' ফিসফিস করে বললো মিলা। 'যেদিন প্রথম আবিষ্কার করি, জাহাজে রয়েছে লোকটা, সেদিনই কেমন একটা অশুভ গন্ধ পেয়েছিলাম আমি। তবু এত-দিন মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম, আমার এই ভ্রমণের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই, একই জাহাজে আমার আর ওর এক সাথে একই জায়গায় যাওয়াটা নিছক কাকতালীয় একটা ঘটনা...।' রেলিং-এ হেলান দিয়ে কুয়াশার মুখের দিকে তাকালো ও। 'বিপদ ঘটে

যাওয়ার আগেই খবরটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। পুরো ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্নের মতো, এমন কিছু যে কখনো ঘটতে পারে কল্পনাই করিনি···কিন্তু এখন দেখছি সত্যিই ঘটেছে। যাকগে, এখন জেনে গেছি, এরপর ওর মুখোমুখি হলে সেভাবেই হবো। এতদিন তো জানতামই না, ও কিছু জানে।'

'মিস নোভাক, তুমি কি একা ভ্রমণ করছো?' আচমকা জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'হ্যাঁ। সম্পূর্ণ একা।' মৃদু হাসলো মিলা. একটু যেন বিদ্রূপ মেশানো তাতে। 'একা বেড়িয়ে অভ্যস্ত আমি। আর নিরাপত্তার কথা ভেবে যদি বলে থাকেন তাহলে বলবো, নিজের নিরাপত্তার দিকটা আমি নিজেই দেখতে সক্ষম।'

'ভালো, কিন্তু এ ক্ষেত্রে উচিত হয়নি কাজটা,' একটু ইতস্তত করে বললো কুয়াশা। 'আমি জানি না কোথায় কি জন্যে যাচ্ছো, তবে ফ্যারেলের কথা শুনে মনে হয়েছে, একা আসা উচিত হয়নি তোমার। অবশ্য তুমি কি করবে না করবে সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার, আমার কোনো অধিকার নেই নাক গলানোর, তবু না বলে পারছি না, এই ফ্যারেল লোকটাকে ছোট করে ভাবা উচিত হবে না।'

'মোটেই ছোট করে ভাবছি না ওকে,' শান্ত গলায় বললো মেয়েটা। 'ভালো করেই জানি, বিপদের সম্ভাবনা আছে, তবু ঝুঁকিটা নিয়েছি, এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।'

ভুরু কুঁচকে তাকালো কুয়াশা।

'জানি না কি ঝুঁকি তুমি নিয়েছো. তবে এটুকু জানি ফ্যারেল আর তার সঙ্গীদের সাথে পাল্লা দেয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মেয়েটা। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'বোধহয় ঠিকই বলেছেন আপনি। কারো সাহায্য দরকার আমার,···একমাত্র আপনিই পারেন সাহায্য করতে মিস্টার আলী।'

'আমি !?'

'হ্যাঁ, আপনি,' প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকালো মিলা। 'ফ্যারেলের মতো লোকদের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে আপনার, তাই না ? আপনিই পারবেন ওর মোকাবেলা করতে। আপনি অভ্যস্ত এসব—।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও !' বাধা দিয়ে বললো কুয়াশা। 'আমি মোকাবেলা করতে পারবো এ ধারণা হলো কেন তোমার ? আমি এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত তা-ই বা তোমার ধারণা হলো কি করে? কোন ধরনের কাজের কথা তুমি বলছো তা-ও তো বুঝতে পারছি না।'

'ওহ—বিপদ, রোমাঞ্চকর—,' অস্থির ভাবে হাত নাড়লো মেয়েটা, 'আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম, কিন্তু তুমি কি করে জানলে এসব ?'

'আপনার বন্ধু জোনাথান বলেছে।'

'জোনাথান বলেছে!' ভেতরে ভেতরে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো কুয়াশা। 'জোনাথানকে চেনো নাকি ?'

'তা একটু চিনি বটে। অবশ্য প্রথমেই ওর কাছে যাইনি, স্টুয়ার্ডের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আপনার সম্পর্কে। স্টুয়ার্ড বললো সেকেণ্ড অফিসার জোনাথান নাকি আপনার বন্ধু। গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম জোনাথানকে।

'ব্যস গড় গড় করে বলে দিলো জোনাথান, আমি···।'

'না অত সহজে বলেনি। যথেষ্ট কসরত করতে হয়েছে কথা-গুলো বের করতে। প্রথমে তো খেদিয়েই দিতে চায়। শেষে অনেক পীড়াপীড়ি আর কৌশলের পর বললো।'

'কি বললো ?'

জবাব দেয়ার আগে এক মুহূর্ত সময় নিলো মিলা। 'বললো, আপনি কুয়াশা, একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধক, বিজ্ঞান সাধনার জন্যে অনেক টাকা দরকার আপনার, সেই টাকা সংগ্রহের জন্যে কখনো কখনো একটু আধটু আইনের বাইরে পা বাড়াতেও কুণ্ঠিত হন না, জীবনে বহু দুঃসাহসিক কাজ করেছেন বিজ্ঞান সাধনার প্রয়োজনে টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে···।'

ডিনারের সময় যেমন হয়েছিলো এবারও তেমন হাঁ হয়ে গেল কুয়াশার মুখ। 'জোনাথান বলেছে এসব !?'

'বললাম তো, অনেক পীড়াপীড়ির পর···।'

'বুঝেছি, দুনিয়ার মানুষের ওপর আর বিশ্বাস রাখা যাবে না।'

'দেখুন, ওভাবে ভাববেন না আপনি। প্রাণ গেলেও আমি প্রকাশ করবো না আপনার পরিচয়।'

একটু হাসলো কুয়াশা।

'বেশ, তবু তো তোমার কোনো কাজে আসছি না আমি।'

'অবশ্যই আসছেন। আমার সমস্যাটা আগে শুনুন—তবে তার আগে আমার জানতে হবে আপনি সাহায্য করছেন কিনা আমা-কে ?'

কৌতুকের চোখে কুয়াশা তাকালো মেয়েটার দিকে।

'ব্যাপারটার কিছুই আমি জানি না এখনো, কি করে বলবো সাহায্য করতে পারবো কি পারবো না ?'

'আমি জানি আপনি পারবেন, কুয়াশা।'

'তবু আগে শুনতে চাই পুরোটা।'

'ঠিক আছে শুনুন···।' একটু ইতস্তত করলো মিলা। 'কোথা থেকে যে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। আমার জীবন কাহিনী শুনিয়ে বিরক্ত করতে চাই না আপনাকে, কিন্তু সাহায্য করতে হলে সব জানা দরকার আপনার।'

'এখনো কিন্তু বলিনি, সাহায্য করবো,' বললো কুয়াশা।

'তা বলেন নি, কিন্তু জানি, আপনি করবেন!'

অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটা। মৃদু একটু হাসলো কুয়াশা।

'ঠিক আছে, শুরু করো, শুনেই দেখা যাক তোমার জীবন ইতিহাস।'

'বেশ···প্রথমেই বলে নিই, আমার আসল নাম, মিলা নোভাক নয় উর্মিলা—উর্মিলা সিং। মিলা আমার ডাক নাম আর নোভাক মায়ের পদবী। আমার বাবার নাম রাজেন্দ্র সিং।'

অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ গোপন একটা কিছু বলছে, এমন ভঙ্গিতে কথা ক'টা বলে গেল মেয়েটা।

'আচ্ছা!' বললো কুয়াশা, 'তোমার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিলো, খাঁটি ইউরোপীয় নও তুমি। যাহোক, কিছুক্ষণ আগে রাজেন্দ্র সিং নামটা শুনেছি ফ্যারেলের মুখে, পরিচিত মনে হয় নি।'

'ফালির রাজা ছিলেন তিনি—সম্ভবত রাজ্যটার নামও পরিচিত মনে হচ্ছে না আপনার কাছে!'

'না ফালির নাম শুনেছি। হায়দ্রাবাদের উত্তরে ছোট্ট একটা

রাজ্য, ব্রিটিশ সরকারকে নির্দিষ্ট অঙ্কের কর দিয়ে ভারত ভাগের আগ পর্যন্ত স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলো। হ্যাঁ, রাজেন্দ্র সিং নামটাও এখন একটু চেনা চেনাই লাগছে বটে।'

'এই ফালির রাজকন্যা আমি, বিশ্বাস হচ্ছে? আমার মা ছিলো ইংরেজ। বাবার সাথে লণ্ডনে পরিচয় হয় ওর। সামান্য ক'দিনের পরিচয়ে মা বিয়ে করে ফেললো বাবাকে, এবং ভারতে চলে গেল বসবাস করার জন্যে।' এখানে একটু ইতস্তত করলো ঊর্মিলা। 'মা বাবাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসতো বলে, না রাজার বউ হিসেবে রাজপ্রাসাদে থাকাটা বেশ রোমান্টিক একটা ব্যাপার মনে হয়েছিলো বলে বাবাকে বিয়ে করেছিলো ঠিক জানি না। যাহোক, আমার বয়েস যখন দু'বছর তখন মার মনে হলো ভারতের আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। আমাকে নিয়ে লণ্ডনে ফিরে গেল মা। প্রথম দিকে প্রায়ই বাবা গিয়ে দেখে আসতেন আমাদের। কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে গেল যাওয়া আসা, তবে মাসে একখানা করে চিঠি আমরা পেতাম···।' হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো ঊর্মিলা। 'বিরক্ত লাগছে না তো এসব শুনতে?'

'নিশ্চয়ই না, বলে যাও।'

'কয়েক বছর পর হঠাৎ একদিন চিঠি আসা-ও বন্ধ হয়ে গেল। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম আমরা। ব্যাপার কি জানার জন্যে আমি আর মা ভারতে যাবো ভাবছি, এমন সময় একদিন এক আইনজীবী এলেন আমাদের সাথে দেখা করতে। বছর তিনেক আগের কথা সেটা। উকিল বললেন বাবা নাকি মারা গেছেন। বেশ কিছু দিন ধরেই নাকি তাঁর মনে হচ্ছিলো, আর বেশি দিন বাঁচবেন না, শেষে বিশেষভাবে তৈরি এক সমাধিমন্দিরে ঢুকে মুখ আটকে দেন

তিনি—।'

'কি করেন !?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'বিশেষভাবে তৈরি এক সমাধিমন্দিরে ঢুকে মুখ আটকে দেন। ঐ আটকানো মুখ আর কখনো খোলেননি—।'

'মিস নোভাক—আঁ, ঊর্মিলা—নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছো না আমার সাথে !'

'না, কুয়াশা, সত্যি কথাই বলছি আমি। আমার বাবা ভারতীয়, জীবন সম্পর্কে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা !'

'সে আমি খুব ভালোই জানি,' অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো কুয়াশার গলা। 'আমি নিজেও ভারতীয় উপমহাদেশেরই লোক। কখনো তো শুনিনি কেউ সমাধিমন্দিরে ঢুকে দরজা আটকে দেয়—তাও আবার এ যুগে !'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ঊর্মিলা।

'আমি সংক্ষেপে সারতে চাইছিলাম, কিন্তু আপনি যেভাবে খুঁত ধরছেন তাতে তো খুঁটিনাটি সব ব্যাখ্যা করতে হবে···। তাহলে শুনুন, আমার বাবা ছিলেন আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ। সারাটা জীবন তাঁর মনকে তাড়া করে বেড়িয়েছে একটাই চিন্তা, পূর্বপুরুষদের যাবতীয় পাপের দায় শোধ করতে হবে তাঁকে।'

'কি পাপ ?'

'মধ্যযুগের প্রায় সব রাজা-ই যে পাপ করেছে—হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। মার কাছে শুনেছি, কেন জানি না বাবার ধারণা হয়েছিলো, পূর্বপুরুষদের যাবতীয় পাপস্খালন করতে হবে তাঁকে,' একটু কাব ঝাঁকালো ঊর্মিলা, 'সুতরাং যখন তাঁর ধারণা হলো, আর বেশি-দিন বাঁচবেন না তখন ঐ সমাধিমন্দিরে ঢুকে পড়লেন, শেষ কটা

দিন পৃথিবীর সবকিছু ভুলে তপস্যা করে কাটাবেন।'

'মনে হচ্ছে একটু বেশি মূল্য দিয়েছেন ভদ্রলোক। যাহোক, তারপর? আর কি বললো উকিল?'

'আর বিশেষ কিছু না। বাবার উইলটা পড়ে শোনালেন; হঠাৎ করেই আমরা আবিষ্কার করলাম, কি বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন বাবা, আর তার সবই দিয়ে গেছেন আমাদের।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ঊর্মিলা। 'গোলকুণ্ডার ধনরত্নের কথা শুনেছেন কখনো? না? তাহলে শুনুন, ওগুলোর জন্যেই আমি যাচ্ছি ইণ্ডিয়ায়। এখন নিশ্চয়ই কিছু কিছু আঁচ করতে পারছেন?'

'বলে যাও।'

'ফালি থেকে বিশ মাইল মতো দূরে একটা জায়গা গোলকুণ্ডা। প্রাচীন এক শিবমন্দির ছাড়া আর সব এখন ধ্বংসস্তূপ। স্থানীয় পুরোহিতরা দেখাশোনা করে বলেই এখনো টিকে আছে শিবমন্দিরটা। এক কালে সমৃদ্ধিশালী এক নগরী ছিলো গোলকুণ্ডা, এর রাজাদের কোষাগারে ছিলো বিপুল ধনরত্ন আর কিংবদন্তীর সেই গোলকুণ্ডার মুকুট।'

'হুঁ। এই মুকুটের কথাই তাহলে বলছিলো ফ্যারেল?'

'হ্যাঁ। গোলকুণ্ডা যখন আওরঙ্গজেবের দখলে আসে তখন তিনি একটা রত্নও পাননি, তার আগেই সব লুকিয়ে ফেলে স্থানীয় রাজা। পরে বহু চেষ্টা করেও ওগুলোর কোনো খোঁজ পাননি আওরঙ্গজেব, ওগুলো কোথায় আছে না আছে সে সম্পর্কে একটা কথা-ও বের করতে পারেননি রাজার মুখ থেকে। রাজার মৃত্যুর পর—মৃত্যু না বলে হত্যা বলাই বোধহয় ভালো—চাপা পড়ে যায় ধনরত্নের প্রসঙ্গটা। যেখানে লুকানো হয়েছিলো সেখানেই রয়ে যায় রত্ন-

গুলো। গত তিনশো বছরে কেউ ওগুলোর খোঁজ পায়নি।'

'এবং তোমার বাবা সেগুলো খুঁজে পেয়ে তোমাদের দান করে গেছেন?' জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'হ্যাঁ। কোথায় বা কি করে ওগুলো পেয়েছিলেন বাবা, তা বলতে পারবো না—হয়তো ঘটনাচক্রে পেয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু মা একদিন বলছিলো, বিয়ের কিছুদিন পরেই নাকি বাবা তাকে বলেছিলেন ওগুলোর কথা। মা ওটাকে কিংবদন্তী হিসেবে ধরে নেয়—'

'তুমি ঠিক জানো ওটা সত্যিই কিংবদন্তী ছিলো না?'

'না।' মাথা নাড়লো ঊর্মিলা। 'সত্যি সত্যিই ধনরত্নগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন বাবা।'

'এবং তোমাদের বলে গেছেন, কোথায় ওগুলো লুকানো আছে?' অবিশ্বাস কুয়াশার গলায়।

'না, সরাসরি অমন কিছু বলেন নি বাবা, তবে আমি জানি, কি করে ওগুলোর কাছে পৌঁছানো যাবে।'

'ম্‌ম্‌।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রেলিং-এ কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। 'তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর তিন বছর পেরিয়ে গেছে, এতদিন কেন তোমরা সম্পত্তি দাবি করোনি?'

কাঁধ ঝাঁকালো মেয়েটা।

'প্রথম কারণ, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো মা। কখনোই খুব একটা সুস্থ সবল দেখিনি তাকে, কিন্তু বাবার মৃত্যু সংবাদে একেবারে ভেঙে পড়লো। একটানা দু'বছর রোগে ভুগে মারা গেল মা। এই সময় তার শুশ্রূষা ছাড়া আর কোনো দিকে মন দেয়ার অবসর আমার ছিলো না। গত বছর মা মারা যাওয়ার পর মানসিকভাবে এত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম যে টাকা পয়সা বা সম্পত্তির কথা মনেই

রইলো না আর। কিন্তু কিছুদিন যেতেই যখন হাত একদম খালি হয়ে গেল তখন বুঝলাম জীবনে বেঁচে থাকতে হলে টাকার কি ভীষণ দরকার!'

'হ্যাঁ, টাকা খুব দরকারি জিনিস, পৃথিবীর আর কেউ স্বীকার না করুক, আমি স্বীকার করি এর প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু তাই বলে এর জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নেয়া? উঁহুঁ,' মেয়েটা নিরুৎসাহিত হবে এই আশায় বললো কুয়াশা। 'গোলকুণ্ডার ধনরত্নগুলোর কথা না হয় বাদ-ই দিলাম, তোমার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করতেই কি অবস্থা হয় দেখোগে।'

'সম্পত্তি তো বটেই, ধনরত্নের ওপরেও সম্পূর্ণ আইনগত অধিকার রয়েছে আমার।'

'আমি তো কোনো দ্বিমত পোষণ করছি না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আইনত তোমার হলেও অত দূরের একটা দেশ থেকে এসে অন্য দেশের মাটি থেকে ঝুড়ি বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে যাওয়াটা খুব সহজ কাজ নয়। একটা উদাহরণ দেই, রত্নগুলো ভারতের বাইরে নেবে কি করে তুমি? হাতব্যাগে ভরে? একটু কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করো, তাহলেই বুঝবে কি অসম্ভব একটা আশা তুমি করছো।'

ঠোঁট কামড়ালো ঊর্মিলা।

'আপনি এমনভাবে বলছেন যেন ভয়ানক বোকামি করে—।'

'সত্যি ঊর্মিলা,' হাসলো কুয়াশা, 'ব্যাপারটা বোকামিই হচ্ছে। এ ধরনের কাজ করতে গেলে নানা রকম বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তুমি একা একটা মেয়ে কিভাবে সামলাবে সে সব?

'কি ধরনের বিপদ?'

'এই ধরো, আর কেউ নিশ্চয়ই জানে ধনরত্নের কথা, সে বা

তারা কি এত সহজে তোমাকে নিয়ে যেতে দেবে ওগুলো ?'

'আর কেউ জানে না। আমার ধারণা, জানলে একজন লোকই জানতে পারে তিনি আমার চাচা, আমার বাবার চাচাতো ভাই, কুমার সিং। এখন ফালির রাজা তিনি। উনি কোনো ক্ষতি করবেন না আমার। যত যা-ই হোক আমি তাঁর ভাইয়ের মেয়ে—।

'তাতে কিছু এসে যায় না.' গম্ভীর গলায় বললো কুয়াশা। 'ধন-রত্ন শব্দটা শুনলেই অনেকে অনায়াসে চোখ উল্টে নিতে পারে —সে চাচা-ই হোক আর ভাই-ই হোক। আর এই ফ্যারেল লোকটার ব্যাপার কি ? ও কিভাবে আসছে তোমার কাহিনীতে ? বলছিলে, ওর কথা নাকি আগে থেকেই জানো ?'

'হ্যাঁ, তবে কখনো গুরুত্ব দিইনি। যেদিন প্রথম আবিষ্কার করলাম "ফ্লাইং ডাকে" আছে ও সেদিন থেকে একটু গুরুত্ব দিচ্ছি বটে, কিন্তু ভেবে পাইনি কি ধরনের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে ও। ফালিতে আমার বাবার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলো লোকটা। আমার জন্মের কিছুদিন পরেই ওকে বরখাস্ত করেন বাবা, কেন এখন আর মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে, আমাদের লণ্ডনের বাসায় একদিন ওর একটা ফটোগ্রাফ দেখে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে লোকটা। মা জানিয়েছিলো ওর পরিচয়, সেই সাথে এ-ও বলেছিলো ভীষণ পাজী লোকটা। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। মা মাঝে মাঝে আমাকে পাজী বলে বকা ঝকা করতো, কিন্তু বড় মানুষ যে পাজী হয় তা আমার ধারণা ছিলো না। তাই প্রায়ই ছবিটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, এ-ও আমার মতো পাজী। চেহারাটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিলো। সে কারণেই জাহাজে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওকে চিনতে

পেয়েছিলাম।'

'আমার ধারণা,' বললো কুয়াশা, 'ও-ও কোনো না কোনো ভাবে জানতে পারে তোমার বাবার খোঁজ পাওয়া ধনরত্নের কথা। এবং তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই নজর রাখতে থাকে তোমার ওপর, কবে যাও ওগুলো আনতে।'

'কিন্তু সে কথা আমি জানবো কি করে? জানলেও কি করতাম? একদল প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়ে আসতাম সঙ্গে?'

'এখন যেভাবে এসেছো তার চেয়ে সে-ও বোধহয় ভালো ছিলো, মিস সিং।'

'মিস সিং নয়, ঊর্মিলা বলে ডাকবেন আমাকে। শুধু মিলা-ও বলতে পারেন, বন্ধুরা ঊর্মিলা বলতে হিমসিম খেতো তাই সংক্ষেপ করে এখন শুধু মিলা বলে।'

'বেশ, আমি তাহলে ঊর্মিলা-ই বলবো, মিলার চেয়ে ঊর্মিলা অনেক সুন্দর।'

'ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে বলবেন, কিন্তু আমি এখন কি করবো?'

'সত্যিই যদি আমার পরামর্শ চাও তাহলে বলবো, কলম্বোয় নেমে ইল্যাণ্ডের পথে প্রথম যে জাহাজ পাও তাতে উঠে পড়ো। গোলকুণ্ডার ধনরত্ন, মুকুট এসব বের করে দাও মাথা থেকে।'

'অসম্ভব!' মাটিতে একটা পা ঠুকে ঝট করে কুয়াশার মুখের দিকে তাকালো ঊর্মিলা। 'কেন ফিরে যাবো? ওগুলো আমার, আমার জিনিস কেন আমি ফেলে যাবো? তাছাড়া ফিরে যাওয়ার পথ আর এখন খোলা নেই। অনেক কথা-ই জেনে ফেলেছে ফ্যারেল, আমি ফিরে গেলেও ও আমার পিছু ছাড়বে না।'

'সেক্ষেত্রে রত্নগুলো কোথায় আছে ওকে বলে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়, শান্তিতে ফিরে যেতে পারবে তুমি।'

'তা-ও সম্ভব নয়। আমার সামনে বসে আমার সম্পদ ভোগ করবে, তা-ও আবার ফ্যারেলের মতো বাজে একটা লোক, আর আমি বসে বসে দেখবো—শান্তি বলে কিছু থাকবে আমার মনে?' একমুহূর্ত থামলো উর্মিলা। তারপর তীব্র গলায় বললো, 'আপনি যদি হতেন আমার জায়গায় তাহলে কি করতেন, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ওগুলো ফ্যারেলকে বলে দিয়ে মানে মানে কেটে পড়তেন? বলুন?'

'আঁ, আমার কথা আলাদা!' একটু হাসলো কুয়াশা। 'তোমার মতো নিরীহ একটা মেয়ে নই আমি, তাই না? কেউ আমার গায়ে ঢিল ছুঁড়লে তাকে পাটকেল খেতে হবে। কিন্তু তুমি পারবে ফ্যারেলকে ঠেকাতে?'

'হয়তো না,' বললো মেয়েটা। তারপর উৎসুক গলায় যোগ করলো, 'কিন্তু আপনি যদি থাকেন আমার সাথে, সাহায্য করেন আমাকে, নিঃসন্দেহে ওকে শায়েস্তা করতে পারবো আমরা! ধন রত্ন কোথায় আছে জানি আমি, আর কি করে ফ্যারেলের মোকাবেলা করতে হবে তা জানেন আপনি। আমরা দু'জন এক সাথে হলে খুব সহজেই উদ্ধার করতে পারবো গোলকুণ্ডার গুপ্তধন। জোনাথানের কাছে যে মুহূর্তে আপনার আসল পরিচয় জেনেছি তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আপনাকেই সব খুলে বলবো এবং সাহায্য চাইবো, বিনিময়ে আপনাকে দেবো অর্ধেক ধনরত্ন—না না সাহায্য করার পারিশ্রমিক ভাববেন না, আমি জানি এর একটা কপর্দকও আপনি নিজের জন্যে খরচ করবেন না, মানবতার

কল্যাণে আপনার যে বিজ্ঞান সাধনা—।'

'আমি দুঃখিত, ঊর্মিলা,' বাধা দিয়ে বললো কুয়াশা। 'গোল-কুণ্ডার গুপ্তধনের অর্ধেক—সোজা কথা নয়, তবু আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না। যেখানে জানি, বিপদের সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ, সেখানে তোমার মতো একটা নিরীহ মেয়েকে টেনে নিয়ে যাই কি করে?'

'কিন্তু, কুয়াশা—।'

'না, ঊর্মিলা।'

অনুনয়ের দৃষ্টিতে কুয়াশার চোখের দিকে তাকালো মেয়েটা। কিন্তু একটুও নরম হলো না কুয়াশার শান্ত দৃষ্টি।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললো ঊর্মিলা। 'দরকার নেই আপনার সাহায্যের। আমি একাই যাবো। যদি মরি-ও কারো কোনো দায় থাকবে না তাতে।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি!'

'না, এখনো যথেষ্ট সুস্থ আছে আমার মস্তিষ্ক! ফ্যারেলের মতো দুর্বৃত্তের ভয়ে ফিরে যাবো বলে এতদূর আসিনি আমি। অন্তত একটা দিক থেকে আমি ওর চেয়ে ভালো অবস্থায় আছি—আমি জানি ও আমার পেছনে আছে কিন্তু ও জানে না যে, আমি চিনে ফেলেছি ওকে।'

যা হয় হবে, ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ঊর্মিলা। আর কুয়াশা এখনো মনে মনে আঁচ করার চেষ্টা করছে, কতখানি গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলছে মেয়েটা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয় মেয়েটার সাথে, এর ভেতর ও কতটুক চিনেছে ওকে? যা বলছে সত্যি সত্যিই যদি তাই করে তাহলে নিঃসন্দেহে কলম্বোতেই বিপদে

পড়বে উর্মিলা। ফ্যারেল পেছনে আছে জানার পর এখন আর আগের মতো স্বাভাবিক আচরণ নিশ্চয়ই করতে পারবে না ও, ফলে সন্দেহ হবে ফ্যারেল আর তার সঙ্গী বা সঙ্গীদের। স্রেফ ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালাবে। উর্মিলার মতো মেয়ের পেট থেকে কথা বের করতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। তারপর ভবিষ্যতে যেন আর কোনো ঝামেলা না পাকাতে পারে সেজন্যে পিঠে একটা ছোরা গেঁথে দেবে, ব্যস।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার মনসুর আলী,' পরিষ্কার নিষ্কম্প গলায় বলে চলেছে উর্মিলা. 'আমি স্যালুনে ফিরে যাচ্ছি, আপনি হাওয়া খান। গুড নাইট।'

ঘুরে দাঁড়ালো সে। তাড়াতাড়ি এক হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেললো কুয়াশা।

'শোনো শোনো, বাচ্চা মেয়ের মতো অমন চটে যেও না!'

'মোটেই চটিনি আমি, আর দয়া করে আমাকে বাচ্চা মেয়ে বলবেন না! গত মাসে আমার বয়স চব্বিশ পুরেছে!'

'ঠিক আছে, ভদ্রমহিলা, মেজাজটাকে একটু ঠাণ্ডা করো, তারপর শোনো।'

'আবার কি শুনবো? আপনার যা বলার তা তো বলেই দিয়েছেন।'

'আমার বক্তব্যে একটু সংশোধনী আনছি, যেহেতু তুমি যুক্তির পথে চলতে চাইছো না, সেহেতু আমাকেও একটু অযৌক্তিক পথে পা বাড়াতে হবে, আর যা-ই হোক তোমার মতো ভালো একটা মেয়েকে তো আর বেঘোরে মরতে দিতে পারি না!'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল উর্মিলার।

'তার মানে—তারমানে আপনি—আপনি সাহায্য করবেন আমাকে ?'

'অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তবে এক শর্তে, এখন থেকে আমি যা বলি তার বাইরে একটা কাজও করতে পারবে না তুমি। কোনো রকম "কিন্তু", "যদি" চলবে না। রাজি ?'

'নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে তর্ক করবো, তাও আবার ওসব বিষয়ে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমি।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'কিন্তু, একটা কথা, কুয়াশা, প্রথমে কি করবো আমরা ? ফ্যারেলকে সরিয়ে দেব দুনিয়া থেকে ?'

'মাথা খারাপ। শুরুতেই খুনের দায়ে ফেঁসে গেলে বাকি কাজ করবো কখন ?'

'দুঃখিত।' হতাশ গলায় বললো মেয়েটা।

'ফ্যারেলের সঙ্গী সম্পর্কে কিছু জানো তুমি ?'

'কিছুই না।'

'লিন ? এই লোকটার নাম শুনেছো কখনো ?'

মাথা নাড়লো উর্মিলা। 'উঁহুঁ।'

'লোকটা সম্ভবত ফ্যারেলের বস। কলম্বো পৌঁছে প্রথম যে কাজটা করতে হবে আমাদের তা হলো, এই লিন-এর পরিচয় জানতে হবে। তার কাজের ধারা সম্পর্কেও যতদূর সম্ভব জেনে নিতে হবে। খুব কঠিন হবে না কাজটা, ফ্যারেলই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে—।'

'খালি আপনাকে ?' 'আমি কি করবো তাহলে ?'

'তুমি আবার কি করবে ? ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হোটেলে যাবে।

আমি না ফেরা পর্যন্ত বেরোবে না।'

'কিন্তু আমি—।'

'কি বললে ? কিন্তু ?'

'না না !' প্রবলভাবে মাথা নাড়লো উর্মিলা। 'সত্যি বলছি, আমি বলিনি !'

'বেশ, এবার তাহলে যাও। সোজা কেবিনে। আর সাবধান, আমার সঙ্গে যে তোমার আলাপ পরিচয় হয়েছে তা কারো সামনে প্রকাশ করবে না, ফ্যারেলের সামনে তো নয়ই। আর এমনিতে স্বাভাবিক আচরণ করবে, আগে যেমন ছিলো সব কিছু এখনো তেমন আছে, ওকে ?'

'ইয়েস, স্যার।'

চার

উইলিয়াম ফ্যারেল আর তার সঙ্গী নেমে এলো ফ্লাইং ডাক থেকে। জেটির ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো ওরা। কয়েক পা এগিয়ে সিগারেট ধরানোর জন্যে এক মুহূর্ত থামলো ফ্যারেল।

'কলম্বো শেরাটন হোটেলে উঠেছে মেয়েটা,' বললো ফ্যারে-

লের সঙ্গী। 'লিন-এর সঙ্গে দেখা করেই ওর সাথে একটু মোলাকাত করে আসতে পারি আমরা, কি বলো ?'

'লিন যদি রাজি হয় তবেই,' সদ্য ধরানো সিগারেটে আরাম করে একটা টান দিয়ে বললো ফ্যারেল।

'নিশ্চয়ই। সে কথা আবার বলতে হবে নাকি ?'

নিভে যাওয়া ম্যাচের কাঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো দু'জন। ফিরেও তাকালো না একটু দূরে বসে থাকা অদ্ভুত দর্শন মূর্তির দিকে।

মূর্তিটা এক বৃদ্ধের। নোংরা ছেঁড়া কাপড় তার গায়ে। কুঁজো হয়ে বসে আছে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। গালে কয়েক দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নির্জলা হুইস্কির কড়া গন্ধ ঘিরে রেখেছে তাকে। দেখলেই মনে হয় বার্ধক্য আর জ্বরার শেষ দশায় পৌঁছে গেছে বেচারা। দাঁতগুলো কালো কালো, শরীরটা উকুন-পোকার আড্ডা। কিন্তু উৎসুক কেউ একটু ঝুঁকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পেতো বৃদ্ধের চোখদুটো আশ্চর্যরকম স্থির এবং সতর্ক।

ফ্যারেল আর তার সঙ্গী এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ন্যাকড়ার পুটুলিটা। মাতালের মতো এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে চললো তাদের পেছন পেছন। হুইস্কির উৎকট গন্ধে কুঁচকে উঠেছে বেচারার নাক।

লোকটা আর কেউ নয়, কুয়াশা। মদাসক্ত বুড়ো হাবড়ার ছদ্মবেশটা নিখুঁত করার জন্যে পুরো এক বোতল হুইস্কির মাত্র দু ঢোক খেয়ে বাকিটুকু ঢেলে দিয়েছে গায়ের ন্যাকড়াগুলোর ওপর। ফলে ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মদের গন্ধে জীবন দুর্বিষহ

হয়ে পড়েছে।

বন্দরের বাইরে এসে দ্বিতীয় বারের মতো থেমে দাঁড়ালো ফ্যারেল আর তার সঙ্গী। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেটের পোড়া শেষাংশ তুলে নেয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়লো কুয়াশা। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড এক লাথি এসে লাগলো তার নিতম্বে। রাস্তার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, ইউনিফর্ম পরা লম্বা এক সিংহলী কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'ভাগ এখান থেকে, ব্যাটা মাতাল!' চিৎকার করে উঠলো পুলিসটা।

মাতালের মতো নিখুঁত ভঙ্গিতে একটা হেঁচকি তুললো কুয়াশা, টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো তারপর।

'বুড়োকে কেন—হিক—খামোকা লাথি মারছো বাওয়া?' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো ও। 'আমরা সবাই তো—হিক—ভাই ভাই, হিক – কি বলো?'

'গেলি এখান থেকে, ব্যাটা মাতাল! আবার ভাই হতে এসেছে! ভাগ এক্ষুণি, নয় তো পিটিয়ে লম্বা বানাবো!'

'লে বাওয়া—হিক—পিটিয়ে লম্বা বানাবে। তার চেয়ে—হিক—কেটে পড়াই ভালো,' বিড় বিড় করতে করতে এগিয়ে চললো কুয়াশা। ফ্যারেল আর তার সঙ্গী বেশ কৌতুকের সাথে দেখলো দৃশ্যটা। তারপর হাঁটতে শুরু করলো আবার।

কয়েক সেকেণ্ডের ভেতরই কুয়াশাকে পেরিয়ে গেল ওরা। যেতে যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ফ্যারেল।

'জলদি কেটে পড়ো, বুড়ো,' খ্যাঁক করে একটু হেসে বললো সে। 'ঐ আসছে পুলিসটা।'

উর্মিলাকে সাহায্য করতে রাজি হওয়ার পর তিন দিন কেটে গেছে। অসুখের অজুহাতে এই তিন দিনে একবারও কেবিন ছেড়ে বেরোয়নি কুয়াশা। তার প্রধান কারণ ও ভেবেছিলো ফ্যারেল যত কম দেখে ওর চেহারা ততই মঙ্গল, আর একটা কারণ, মুখে তিনদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ওকে কেমন দেখায় জেনে ফেলুক ফ্যারেল তা চায়নি ও। কৌশলটা যে কাজে লেগেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একেবারে কাছ থেকে দেখেও ওকে চিনতে পারেনি ফ্যারেল বা তার সঙ্গী।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওদের অনুসরণ করে চললো কুয়াশা। কিছুক্ষণের ভেতর ডক এলাকা ছেড়ে নোংরা এক ঘিঞ্জি এলাকায় এসে পড়লো ওরা। সরু সরু গলি একেবেঁকে এগিয়ে গেছে, অনেকটা পুরনো ঢাকার মতো। এ গলি সে গলি পার হয়ে এগিয়ে চললো ফ্যারেল আর তার সঙ্গী। ওর মতোই নোংরা পোশাক-আশাক পরা বহু মাতালকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলো কুয়াশা গলিগুলোয়। একটু স্বস্তি বোধ করলো ও মনে মনে। ফ্যারেল যদি এখন পেছন ফিরে তাকায়-ও, অন্য মাতালগুলো থেকে আলাদা করে চিনতে পারবে না ওকে।

অনেক গলিঘুঁচি পেরিয়ে অবশেষে একটা গলির শেষ প্রান্তে থামলো ফ্যারেল আর তার সঙ্গী। একটা বড় দরজা গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাড়াতাড়ি একটা দেয়ালের আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো কুয়াশা। মুখটা সামান্য বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো, দরজায় ঠেলা দিলো ফ্যারেল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল এক পাল্লার দরজাটা। তারমানে ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো না ওটা। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো ফ্যারেল

আর তার সঙ্গী। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার। এখনো কি ভেড়ানোই রইলো, না আটকে দেয়া হলো ভেতর থেকে?—ভাবতে ভাবতে দ্রুতপায়ে সেদিকে এগোলো কুয়াশা।

কয়েক সেকেণ্ড লাগলো দরজার কাছে পৌঁছুতে। ঠেলা দিতেই স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলো, তখনো ভেড়ানো রয়েছে দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়নি। চটপট ভেতরে ঢুকে পড়লো ও। দরজাটার সমান চওড়া একটা করিডোর চলে গেছে নাক বরাবর। দু'পাশে কয়েকটা বন্ধ দরজা। ও প্রান্তে আরেকটা দরজা। সেটার ওপরের অংশে জানালার মতো কাচ লাগানো। পলকের জন্যে কাচের ওপাশে ফ্যারেলের চেহারাটা একবার দেখলো কুয়াশা। পেছন ফিরে তাকালে ফ্যারেলও দেখতে পেতো ওকে। কিন্তু তাকালো না সে। সঙ্গীকে নিয়ে এগিয়ে গেল সোজা।

আগের মতোই দ্রুতপায়ে করিডোরের শেষ মাথায় দরজাটার কাছে পৌঁছুলো কুয়াশা। ঠেলা দিতে খুলে গেল এটাও। বড়সড় একটা কামরায় ঢুকলো ও। লোকে গিজ গিজ করছে কামরাটা, বেশির ভাগই চাইনিজ নয়তো মালয়ী। সিংহলীও আছে দু-এক-জন। প্রত্যেকের গায়ে নোংরা কাপড়-চোপড়। পুরনো প্যাকিং বাক্স কেটে বানানো টেবিল-চেয়ারে বসে তারা। অনেকে মাটি-তেও বসে আছে গাদাগাদি করে। ঘরের চার কোণায় চারটে হ্যারিকেন জ্বলছে টিম টিম করে। বেশির ভাগ লোকের হাতেই কল্কে দেখতে পেলো কুয়াশা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটা। সেই সাথে দেশী মদের নাক জ্বলা গন্ধ। সব মিলিয়ে গা ঘিন ঘিন করা একটা পরিবেশ। অনেক কষ্টে এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা দমন করলো কুয়াশা।

চারদিকে তাকিয়ে ফ্যারেল আর তার সঙ্গীকে খুঁজলো ও। কিন্তু দেখলো না একজনকেও। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে সেটা ছাড়া আরো একটা দরজা আছে কামরায়। বোধহয় ঐ দরজা দিয়ে ভেতর বাড়িতে ঢুকে গেছে ফ্যারেল, ভাবলো কুয়াশা।

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ও। তারপর মাটিতে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা লোকজনের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোলো বারের দিকে। বারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী এক চাইনিজ। মুখে বসন্তের দাগ। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। প্রায় ছেঁড়া দুমড়ানো মোচড়ানো একটা সিংহলী নোট বের করলো কাপড়ের ভেতর থেকে।

'মদ।' কর্কশ গলায় বললো ও।

বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালো না চাইনিজ। দীর্ঘ সময় নিয়ে কুয়াশার বাড়িয়ে দেয়া টাকাটা পরীক্ষা করলো। তারপর ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখলো নিজের পকেটে। ঘুরে দাঁড়িয়ে র‍্যাক থেকে ছোট একটা বোতল আর একটা ফাটা গেলাস নিয়ে এলো। ছোঁ মেরে বোতল আর গেলাসটা নিলো কুয়াশা। তারপর টলতে টলতে এগোলো সেই দরজার দিকে।

দেয়ালের পাশে প্রায় পাঁচ মিনিট গুঁড়ি মেরে বসে রইলো ও। ভাব দেখালো অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পান করছে বোতলের তরল পদার্থ, আসলে সবটাই ফেলে দিলো মেঝেতে নয়তো নিজের কাপড়ে। ফাঁকে ফাঁকে চোখ বুলালো অন্য লোকগুলোর ওপর। দেখলো সন্দেহ করা তো দূরের কথা, কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না ওর দিকে। বারের লোকটা ধারালো একটা ছুরির ফলা দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে।

দরজা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লে কি হবে, একবার ভাবার চেষ্টা করলো কুয়াশা। ওপাশে কি আছে না আছে সে সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা নেই ওর। নিঃসন্দেহে বিপদ হতে পারে। কিন্তু কি ধরনের বিপদ ? যা-ই হোক না কেন, ঝুঁকিটা নিতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই এটা লিন-এর আস্তানা। আস্তানায় ঢুকেও ওর সম্পর্কে কোনো খোঁজ না নিয়ে ফিরে যাওয়াটা বোকামি। আর লিন সম্পর্কে কিছু জানতে হলে ঢুকতেই হবে ভেতরে।

যতক্ষণ না অন্য এক জন গ্রাহককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো বারম্যান ততক্ষণ অপেক্ষা করলো কুয়াশা। তারপর আস্তে একটা হাত উঠিয়ে দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরলো। কেউ খেয়াল করছে কিনা দেখলো একবার। না, আগের মতোই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই। বারম্যানও নতুন লোকটার এগিয়ে দেয়া টাকা পরীক্ষা করছে। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে হ্যাণ্ডেলটা ঘোরালো ও। সামান্য ফাঁক হলো দরজা। তারপর মদের ঘোরে উল্টে পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে গড়িয়ে গেল দরজার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড অচেতনের মতো পড়ে রইলো, যাতে ব্যাপার কি পরীক্ষা করতে এলেও কেউ যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে। পাঁচ সেকেণ্ড পরেও যখন কিছু ঘটলো না, আরেকটু গড়িয়ে গেল ও। তারপর আস্তে ভিড়িয়ে দিলো দরজা।

আবার সরু একটা প্যাসেজে এসে পড়েছে কুয়াশা। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা পর্দা ঝুলছে আর ওর ঠিক ডানেই প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার বুদ্ধিটা আপাতত বাতিল করে দিলো ও। পর্দার ওপাশে কি আছে, দেখতে হবে আগে। দ্রুত অথচ বিড়ালের মতো নিঃশব্দে

এগিয়ে গেল সেদিকে। মাত্র দু'পা এগিয়েছে কি এগোয়নি, এমন সময় শুনতে পেলো অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর, ওপর থেকে ভেসে আসছে। অস্পষ্ট হলেও ফ্যারেলের গলা চিনতে ভুল হলো না কুয়াশার।

পর্দার ওপাশে কি আছে পরে জানলেও চলবে। ফিরে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো কুয়াশা। ওপরে, সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে, ছোট্ট একটা ল্যাণ্ডিং। তার ওপাশে একটা দরজা, হাল্কা কাঠ দিয়ে যাচ্ছে তাই ভাবে তৈরি। কপাটটা লাগানো, তবু এখানে ওখানে দুতিনটে সরু ফাঁক দেখা যাচ্ছে। এই ফাঁক গলেই বেরিয়ে এসেছে ফ্যারেলের কণ্ঠস্বর।

ল্যাণ্ডিং-এ উঠে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ রাখলো একটা সরু ফাঁকে। নিচু ছাদওয়ালা ছোট্ট একটা কামরার কিছু অংশ ভেসে উঠলো ওর সামনে। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ছে দেয়ালের। ঘরের মাঝখানে ছোট একটা টেবিল। টেবিলের সামনে, দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। ফ্যারেল বা তার সঙ্গী নয় লোকটা। কারণ, ফ্যারেল আর তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের অন্য পাশে, দুজনেরই মুখ দরজার দিকে। তৃতীয় লোকটা সম্ভবত লিন, ভাবলো কুয়াশা। প্রতি মুহূর্তে ও আশা করছে, এই বুঝি পেছন ফিরলো লোকটা, কিন্তু না, আপাতত তার পিঠ দেখে আর গলা শুনে-ই সন্তুষ্ট থাকতে হলো ওকে।

লোকটার গলার স্বরে এমন কিছু আছে যে মনে মনে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো কুয়াশা। নিচু কোমল কণ্ঠস্বর। কানে ঢুকে সম্মোহিত করে ফেলতে চায়। এই কণ্ঠস্বরের মালিক

যে দুর্দান্ত মানসিক শক্তির অধিকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'আশা করি আমার নির্দেশগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি, মিস্টার ফ্যারেল। তোমার ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা তোমার ভেতরেই রাখো, আমার কোনো উৎসাহ নেই ওতে। নিত্য নতুন ধারণা উদ্ভাবনের জন্যে পয়সা দেই না তোমাকে, কথাটা মনে রাখবে আশা করি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' বিব্রত ভঙ্গিতে বললো ফ্যারেল। 'তাহলে মেয়েটাকে কিছু বলছি না আমরা?'

'আপাতত, হ্যাঁ। শক্তি প্রয়োগে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না। আমার পছন্দ আরো সূক্ষ্ম পদ্ধতি। মিস সিংকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবো আমরা। দেখবে ও-ই আমাদের পৌঁছে দিয়েছে গুপ্তধনের কাছে। যতক্ষণ না ওগুলো আমার হাতে আসছে ততক্ষণ ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে, তারপর যা খুশি করতে পারো ওকে নিয়ে। কিন্তু তার আগে কিছুতেই যেন ও সন্দেহ করতে না পারে, বিপদ ঘনিয়ে আসছে ওর চারদিক থেকে। আশা করি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছো আমার কথা?'

'কিছু কিছু পারছি, কিন্তু সম্পূর্ণ না, মিস্টার লিন। আপনি বলছেন, যতক্ষণ না আপনার হাতে আসছে গুপ্তধন ততক্ষণ ধৈর্য ধরবো আমরা, তাহলে আমি আর হ্যাগার্ড ছুটছি কেন এর পেছন পেছন? নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, আমরাও ভাগ পাবো গুপ্তধনের?'

'আমি কখনোই কিছু ভুলি না, মিস্টার ফ্যারেল।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো লিন। কুয়াশা দরজার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলো তার চেহারা। মনে মনে একটু শঙ্কিত না হয়ে পারলো না ও। যেমন চেহারা লোকটার, স্বভাবও যদি তেমন হয়

নিঃসন্দেহে ভয়ের কথা সেটা।

এশীয়, সম্ভবত মঙ্গোল। ছ'ফুটের ওপর লম্বা। উঁচু কলার-ওয়ালা কুচকুচে কালো একটা গলাবন্ধ জ্যাকেট তার গায়ে, শরীর-টা খুব ভারি নয়, বরং একটু হ্যাংলা-ই মনে হয়। অস্বাভাবিক দীর্ঘ দুটো হাত; ঝুলে আছে দুপাশে। কিন্তু যে জিনিসটা সবচেয়ে মনোযোগ কাড়লো কুয়াশার তা হলো লোকটার মুখ। বিরাট, পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল, সামান্য হলদেটে রং, নাকটা বোঁচা এবং চওড়া, চোয়ালের হাড়গুলো-ও ছড়ানো। একটাও চুল নেই লোকটার মাথায়, টাক না কামানো ঠিক বুঝতে পারলো না কুয়াশা। ঠোঁট দুটো সরু সরু, কাটা কাটা। কথা বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিন, ফলে দাঁতগুলোও দেখতে পেলো কুয়াশা—সুচালো, মানুষের চেয়ে হিংস্র জন্তুর সাথেই সাদৃশ্য বেশি। ভারি পাতার নিচে সরীসৃপের মতো চোখ জোড়া শীতল আভা ছড়াচ্ছে, প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই তাতে; যেন মরা মানুষের চোখ, ভাব-লেশ শূন্য। চোখ দুটো দেখে কুয়াশার মনে হলো, বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা যেন সঞ্চিত তাতে। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড এক শক্তির আধার বলে মনে হলো লোকটাকে।

দরজার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো লিন।

'আমি কখনো-ই কিছু ভুলি না, মিস্টার ফ্যারেল। তোমারই, মনে হচ্ছে, স্মরণশক্তি খুব দুর্বল। একমুহূর্ত ভাবো, তাহলে নিঃসন্দেহে মনে পড়বে, সেদিন তোমাকে আর মিস্টার হ্যাগার্ডকে আমি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। মনে পড়েছে? সাফল্যের সঙ্গে কাজ শেষ করতে পারলে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক পাবে তোমরা। গুপ্তধনের ভাগ দেয়ার কথা উচ্চারণ-ও করিনি। আমি এক কথার

মানুষ, মিস্টার ফ্যারেল, কাজ শেষ করো, তোমাদের পারিশ্রমিক তোমরা পাবে।'

থামলো লিন। সরু ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে সামান্য হাসলো। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো ফ্যারেলের দিকে।

'নিশ্চয়ই মনে আছে, সেদিন আমি এ-ও বলেছিলাম, বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা যদি দেখি তোমাদের ভেতর, ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করতে হবে···জর্জ ফার্গুসনের কথা নিশ্চয় মনে আছে? ওর পরিণতি কি হয়েছিলো, তা ও আশা করি মনে আছে?' একটু প্রসারিত হলো লিন-এর হাসি। 'জর্জ ফার্গুসন আমার অবাধ্য হয়েছিলো, মিস্টার ফ্যারেল। তার শাস্তি ওকে পেতে হয়েছে।'

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এলো কামরায়। হতভাগ্য ফার্গুসনের কথা কখনো শোনেনি কুয়াশা, কিন্তু লিন-এর ক্রুর হাসি আর ফ্যারেলের কুঁকড়ে যাওয়া ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না, নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর কোনো পরিণতি হয়েছিলো বেচারার।

'তাহলে এ-ই ঠিক থাকছে,' অবশেষে বললো লিন, 'তোমরা কিছু বলছো না মিস সিংকে। সাবধানে অনুসরণ করে যাবে শুধু। ফালিতে আমার সঙ্গে দেখা হবে তোমাদের, তখন—।'

পেছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরলো কুয়াশা। সিঁড়ির শেষ ধাপে এক পা আর ল্যাণ্ডিংয়ের ওপর আরেক পা চাইনিজ বারম্যানটার। হাতে উদ্যত ছোরা। নিচে এই ছোরা দিয়েই দাঁত খোঁচাছিলো ব্যাটা। লিন-এর কথা শুনতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো কুয়াশা, কখন যে লোকটা পা টিপে টিপে উঠে এসেছে টেরই পায়নি। কুয়াশা-ও ঘুরেছে, লোকটাও লাফ দিয়েছে,

সেই সাথে নামিয়ে আনছে ছোরা। তবে ভাগ্য ভালো কুয়াশার. লোকটা এখনো ওকে বৃদ্ধ ই ভাবছে। ফলে খুব একটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। এদিকে চাইনিজটাকে লাফ দিতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেছে কুয়াশার শরীরেও। বজ্রমুষ্টিতে তার ছোরা ধরা হাতটা ধরে ফেললো ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে প্রচণ্ড এক ঘুষি হাঁকালো চোয়াল বরাবর। ছিটকে ল্যাণ্ডিংয়ের কোণায় চলে এলো চাইনিজ। তারপরই তাল হারালো সে। হুড়মুড় করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সিঁড়ির ওপর। একটু পরেই ডিগবাজি খেতে খেতে চলে গেল নিচে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুনোর অনেক আগেই জ্ঞান হারিয়েছে সে। আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না কুয়াশা। নেমে এলো ল্যাণ্ডিং থেকে। এক লাফে পার হলো বারম্যানের স্থির দেহটা। তারপর ছুটলো সরু প্যাসেজ ধরে। কয়েক সেকেণ্ড পরে যখন লিন আর তার দুই অনুচর বেরিয়ে এলো ল্যাণ্ডিং-এ, কুয়াশার ছায়াও দেখতে পেলো না কেউ।

হ্যাঁচকা এক টানে বন্ধ দরজাটা খুললো কুয়াশা। লাফ দিয়ে ঢুকলো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কামরায়। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লোকদের ডিঙিয়ে ছুটলো বাইরের দিকের দরজা লক্ষ্য করে। ধাক্কা খেলো কয়েকজন মাতালের সাথে। গেলাস হাতে দু'তিন জন অস্পষ্ট বিস্ময় নিয়ে তাকালো ওর দিকে। আগের মতো এই দরজাটাও হ্যাঁচকা একটানে খুলে ফেললো কুয়াশা। দু'সেকেণ্ডে পেরোলো করিডোর। এক সেকেণ্ড পর রাস্তায় নামলো ও। তার-পর ভোঁ দৌড়। সর্বশক্তিতে।

পাঁচ

কলম্বোর সেরা হোটেলগুলোর একটা কলম্বো শেরাটন। বিরাট, বিলাসবহুল, প্রাসাদোপম এক আধুনিক অট্টালিকা। বড় বড় জানালাগুলোর ঝকঝকে কাঁচে সূর্যের আলো পড়ে ঝকমক করছে। ভেতরে নরম, পুরু কার্পেট বিছানো মেঝে, চকচকে আসবাব-পত্র। কড়া হুইস্কির গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা কুয়াশা যখন ঢুকলো তখন রীতি-মতো বজ্রপাত হলো যেন হোটেলের এণ্ট্রান্স হলে। ধোপ দুরস্ত পোশাক পরা লোকগুলো বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। বিতৃষ্ণায় চোখ মুখ কুঁচকে গেল অনেকের। কাছাকাছি যারা ছিলো ছিটকে সরে গেল দূরে। কিন্তু গ্রাহ্য করলো না কুয়াশা। সোজা রিসেপশন ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'মিস নোভাক-এর সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

কয়েকবার চোখ পিট পিট করলো কাউন্টারে দাঁড়ানো কেরানী। হুইস্কির নাকজ্বলা গন্ধ সহ্য করতে না পেরে পিছিয়ে গেল এক পা। সামান্য হাঁ হয়ে আছে মুখ—বিস্ময়ে না বিরক্তিতে

বুঝতে পারলো না কুয়াশা।

'মিস নোভাক,' চোস্ত ইংরেজীতে অত্যন্ত মার্জিত গলায় আবার বললো কুয়াশা। 'ওঁর সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার। দয়া করে জানাবেন ওঁকে, আমি এসেছি?'

এবার হতভম্ব হয়ে গেল কেরানী। সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে ভিক্ষুক বললেও কম বলা হয়। এই লোকের মুখ থেকে এমন নির্ভুল ইংরেজী দুঃস্বপ্নেও আশা করেনি বেচারা। কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছলো একবার। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো, কিন্তু থেমে গেল কুয়াশার স্থির শান্ত চোখ দুটোর ওপর চোখ পড়তেই। একটা ঢোক গিলে হাত বাড়ালো ফোনের দিকে।

'কি—কি নাম বলবো?'

'শুধু বলুন কুয়াশা এসেছে।'

'কুয়াশা?' নার্ভাস ভঙ্গিতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো কেরানী। তারপর ডায়াল করলো একটা নাম্বারে। 'রুম এইট ও সিক্স? মিস নোভাক? শার্টের কলার ও গলার মাঝখানে একটা আঙুল ঢুকিয়ে একটু চুলকালো লোকটা। 'একটা লোক দেখা করতে চায় আপনার সঙ্গে। বলছে তার নাম—অ্যাঁ—কুয়াশা।'

ওপাশ থেকে ঊর্মিলা কি বললো, শুনতে পেলো না কুয়াশা, তবে ওকে যে উপরে পাঠিয়ে দিতে বলেছে কেরানীর পরের কথা শুনে তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। একবার রিসিভারের দিকে একবার কুয়াশার দিকে তাকিয়ে আবার রিসিভারের দিকে তাকালো কেরানী। রুমাল বের করে কপালটা মুছলো আবার।

'মিস নোভাক, লোকটাকে ভালোমতো চেনেন তো আপনি?

আমরা—আমাদের এখানে সাধারণত যে ধরনের অতিথি আসে তাদের—তাদের সঙ্গে কোনো মিল নেই এর।' গোপনীয় একটা কথা বলছে, এমন ভঙ্গিতে অত্যন্ত নিচু স্বরে যোগ করলো, 'কড়া মদের গন্ধ বেরোচ্ছে লোকটার গা থেকে, মিস নোভাক।'

এবারও ঊর্মিলার জবাব শুনতে পেলো না কুয়াশা। তবে কেরানীকে দেখলো, রিসিভার নামিয়ে রেখে বিরক্তির সঙ্গে তাকালো ওর দিকে।

'ওপরে চলে যান। মিস নোভাক অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। আট তলা, রুম—'

'এইট ও সিক্স! অনেক ধন্যবাদ!'

দ্রুতপায়ে লিফটের দিকে এগোলো কুয়াশা। লোকজন সব নাক কুঁচকে সরে গিয়ে পথ করে দিলো ওকে। সবেমাত্র নেমে এসেছে একটা লিফট। ওকে এগোতে দেখে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো নারী পুরুষরা। ছিটকে সরে গেল যে যেদিকে পারলো। গট গট করে লিফটে ঢুকলো কুয়াশা। আরো দু'তিন জন দাঁড়িয়ে ছিলো ওপরে ওঠার জন্যে, তারা কেউ ঢুকলো না।

আট তলায় লিফট থেকে নামলো ও। ছয় নম্বর রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আস্তে টোকা দিলো দরজায়—প্রথমে দুইবার পরে একবার। আগেই ঠিক করা ছিলো সংকেতটা। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ঊর্মিলার গলা।

'কে?'

'আমি, কুয়াশা।'

চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো। তারপর ছিটকিনি টানার আওয়াজ। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলো কুয়াশা। দরজা বন্ধ

করে তালা লাগিয়ে দিলো আবার।

'আর কেউ আসেনি তো?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'না,' বললো উর্মিলা। 'জাহাজ থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছি এখানে। সেই থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছি। বিরক্তি ধরে যাচ্ছিলো। আমি তালা বন্ধ ঘরে বসে আছি, আর তুমি মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছো।' ইতিমধ্যে উর্মিলাও কুয়াশাকে তুমি বলতে শুরু করেছে।

'কলম্বোর রাস্তায় এই ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে ঘুরে বেড়ানো খুব একটা মজার ব্যাপার নয়।'

'কিছু জানতে পারলে?'

'প্রচুর।'

'কি?' আগ্রহ উর্মিলার গলায়।

'আগে একটু সাফ সুতরো হয়ে নি, তারপর বলবো। আমার জিনিসপত্র কি আমার রুমে পাঠিয়ে দিয়েছো না এখানেই আছে?'

'বড় কেবিন ট্রাঙ্কটা তোমার রুমে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা, ছোট বাক্সটা নিয়ে এসেছি আমি। ওদের জানিয়েছি, তোমার আসতে দেরি হতে পারে।'

'ভালো করেছো। স্নান করে পোশাক পাল্টে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবো, তারপর সামনে দিয়ে ঢুকবো আবার—মিস্টার মনসুর আলী হয়ে।'

'ছেঁড়া কাপড় পরা মাতালটাকে বোরোতে না দেখলে সন্দেহ করবে না ওরা?'

ছোট স্যুটকেসটা থেকে এক প্রস্থ কাপড় আর শেভ করার সরঞ্জাম বের করলো কুয়াশা। বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দিলো,

'না। তুমি নিচে গিয়ে বলে আসবে, নোংরা লোকটা বিরক্ত করতে শুরু করেছিলো, ওর হাত থেকে বাঁচার জন্যে পেছন দরজা দিয়ে বের করে দিয়েছো ওকে।'

'ঠিক আছে।'

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলো কুয়াশা।

পনের মিনিট পর বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে।

'এবার বলো কি হয়েছে,' জিজ্ঞেস করলো উর্মিলা। 'সারা বিকেল দুঃস্বপ্ন দেখে কাটিয়েছি আমি। কেবলই মনে হয়েছে, আর বুঝি ফিরলে না তুমি।'

'প্রায় সেরকমই হয়েছিলো অবস্থা। তবে ভাগ্য ভালো সেই রহস্যময় লিন-এর দেখা পেয়েছি। ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা-ও কিছু কিছু জানতে পেরেছি।'

'কি রকম?'

ধীরে ধীরে বলে গেল কুয়াশা, ফ্যারেল আর তার সঙ্গী জাহাজ থেকে নামার পর যা যা ঘটেছে সব। খাটের ওপর বসে থুতনীর সঙ্গে হাঁটু ঠেকিয়ে চোখ বড় বড় করে শুনলো উর্মিলা।

'কে এই লিন?' সব শুনে প্রশ্ন করলো সে।

'কোনো ধারণা নেই আমার,' জবাব দিলো কুয়াশা। 'ভেবেছিলাম, সব শুনে তুমি হয়তো বলতে পারবে, হয়তো তোমার বাবার সাথে কোনো না কোনো যোগাযোগ ছিলো এর।'

'এমন কোনো লোকের কথা কোনোদিন বলতে শুনিনি বাবাকে। মাকেও না। চেহারার যা বর্ণনা দিলে তাতে তো মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর লোক এই লিন।'

'ভয়ঙ্কর বলে ভয়ঙ্কর। তোমার ফ্যারেল ওর তুলনায় দুগ্ধপোষ্য

শিশু।'

'বুঝতে পারছি না, কি করে ও গুপ্তধনের কথা জানলো।'

'তোমার বাবার কাছ থেকে যদি না জেনে থাকে, আমার ধারণা, ফ্যারেল বা তার সঙ্গী হ্যাগার্ডের কাছ থেকে জেনেছে। ওরা হয়তো ভেবেছিলো, লিন-এর সহায়তায় গুপ্তধন উদ্ধার করে ভাগা-ভাগি করে নেবে। এখন দেখছে, লিনকে জানিয়ে ফেঁসে গেছে ওরা। আজ ওদের আলাপ শুনে যা বুঝলাম, ফ্যারেল আর তার সঙ্গীকে পুতুলের মতো নাচাচ্ছে লিন। ও সুতো নাড়ছে আর ওরা নাচছে—অন্তত নাচতে বাধ্য হচ্ছে। সম্ভবত এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওদের।'

'তার মানে বলতে চাচ্ছো, ফ্যারেল আর তার সঙ্গীই প্রায় সব কাজ করবে বিনিময়ে বিশেষ কিছু পাবে না?' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ঊর্মিলার চোখ দুটো। 'তাহলে—তাহলে তো একটা সুযোগ আছে আমাদের! ফ্যারেল আর তার সঙ্গীকে যদি লিন-এর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া যায় তাহলে কেমন হয়? ওরা নিজেরা নিজেরা মারামারি করুক, এই ফাঁকে আমরা ধনরত্ন সব উদ্ধার করে কেটে পড়বো!'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয়, ঊর্মিলা। ফ্যারেলরা যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে তা নিশ্চয়ই লিন-ও জানে। এবং শেষ পর্যন্ত যদি তেমন কিছু ঘটে, ওর নিশ্চয়ই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া ফ্যারেল যে অমন বোকামি করবে না সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। ও নিশ্চয়ই জানে, সেক্ষেত্রে বেঘোরে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা শতকরা একশো ভাগ। না।' মাথা নাড়লো কুয়াশা। 'কিছু লোকের ভেতর মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার ক্ষমতা

এত প্রচণ্ড ভাবে থাকে যে, রীতিমতো অতিপ্রাকৃত মনে হয়। ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে নয়তো আদর করে সে তার কাজ আদায় করবেই। লিন হচ্ছে সেই ধরনের লোক। ফ্যারেল কক্ষণো ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার কথা ভাববে না। আসলে ওর হয় তো তেমন ক্ষমতাই নেই।'

কেমন যেন মুষড়ে পড়া চেহারা হলো উর্মিলার।

'তাহলে কি করবো আমরা?'

'এখনো যদি তোমার গোলকুণ্ডার গুপ্তধন উদ্ধারের ইচ্ছা থেকে থাকে, তাহলে এগিয়ে যাবো।'

'ইচ্ছা না থাকার কোনো কারণ নেই। আগেই তো বলেছি, এ পর্যন্ত এসে ফিরে যেতে রাজি নই আমি।'

'তথাস্তু।' উঠে দরজার দিকে এগোলো কুয়াশা। 'যাচ্ছি। পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সামনে দিয়ে ঢুকবো আবার। তারপর খেয়ে নিয়ে ঘুম। কাল সকালেই হায়দ্রাবাদ যাচ্ছি আমরা। এই ফাঁকে তুমি এয়ার লঙ্কা বা এয়ার ইণ্ডিয়ার যেটা আগে পাও —দুটো টিকিট বুক করে ফেল।'

ছয়

পরদিন দুপুর নাগাদ হায়দ্রাবাদে পৌঁছুলো কুয়াশা আর ঊর্মিলা। এয়ারপোর্ট থেকে রেলওয়ে এনকোয়ারিতে ফোন করে জানতে পারলো, কাল ভোরের আগে ফালিতে যাওয়ার মতো কোনো ট্রেন নেই। সুতরাং দিনের বাকি অংশ আর রাতটা হায়দ্রাবাদের প্রথম শ্রেণীর এক হোটেলে কাটালো ওরা। ভোরে গিয়ে উঠলো ট্রেনে।

ফ্যারেল বা তার সঙ্গীর চেহারা এখন পর্যন্ত আর দেখা যায়নি। তবে বুঝতে পারছে কুয়াশা, খুব শিগগিরই আবার উদয় হবে দু'-জন। আশপাশেই কোথাও আছে ওরা।

ফালি স্টেশনে নেমে তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজলো কুয়াশা। কিন্তু দেখতে পেলো না ফ্যারেল বা হ্যাগার্ডকে। দু'জনই হয় ছদ্মবেশে আছে নয়তো আগেই এসে গেছে ফালিতে। পরে আসার ঝুঁকি যে ফ্যারেল নেবে না, অন্তত লিন নিতে দেবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'চলো তাহলে,' ঊর্মিলাকে বললো কুয়াশা। 'রাত কাটানোর

মতো একটা আস্তানা খুঁজে নেই আগে। আমার মনে হয়, যতক্ষণ না আমরা গুপ্তধন উদ্ধারে বেরুচ্ছি ততক্ষণ আর চেহারা দেখাবে না ফ্যারেল।'

প্রাচীন শহর ফালি। মধ্যযুগীয় রীতিতে এর কেন্দ্রস্থলে তৈরি করা হয়েছে রাজকীয় প্রাসাদ। প্রাসাদের একদিকে চমৎকার সুসজ্জিত বাগান, নানা বর্ণের অজস্র ফুলের সমাহার তাতে ; অন্যদিকে একটা কৃত্রিম সরোবর। দিনে সূর্যের আলো আর রাতে প্রাসাদের আলোয় ঝকমক করে সরোবরের স্বচ্ছ জল। বাগান ও সরোবরের পর পুরো প্রাসাদ এলাকা ঘিরে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সম্ভবত প্রাসাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই ফাঁকা রাখা হয়েছে জায়গাটা—প্রাসাদ-রক্ষীরা টহল দেয় সেখানে। এই প্রাসাদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শহর অর্থাৎ ছোট বড় নানা আকারের অট্টালিকা। পুরো শহরটাকে আবার ঘিরে রেখেছে গভীর বন। নানা হিংস্র জন্তু আছে সে বনে। শোনা যায় বাঘও নাকি আছে।

'হোটেল আছে কোনো, তোমাদের এই ফালিতে?' উর্মিলাকে জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'নিশ্চয়ই!' একটু গর্বের সাথে বললো উর্মিলা। 'হতে পারে শহর হিসেবে শত শত বছরের পুরনো, তাই বলে অতীতের ভেতরই পড়ে আছে ফালি তা ভেবো না। ট্যুরিস্টদের জন্যে তিনটে হোটেল আছে এখানে।'

'ভালো কথা। কোনটায় উঠবো আমরা?'

'রাজপুরীতে। এখানকার সবচেয়ে পুরনো আর সেরা হোটেল।'

'এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও।'

'হ্যাঁ।'

হোটেল রাজপুরীতে পৌঁছে দু'জনের জন্যে দুটো কামরা ভাড়া করলো ওরা। তারপর যার যার কামরায় ঢুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সবেমাত্র কাপড় পরেছে কুয়াশা এমন সময় উর্মিলা এসে হাজির ওর দরজায়, হাতে একটা চিঠি।

'ভেতরে আসতে পারি? আমার মনে হলো, এটা তোমার দেখা দরকার।'

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'মাকে লেখা বাবার শেষ চিঠি।'

একটু ইতস্তত করলো কুয়াশা।

'এ চিঠি পড়া কি উচিত হবে আমার?'

'অসুবিধা নেই। ব্যক্তিগত কিছু নেই এতে। গুপ্তধনের কাছে কি করে পৌঁছুনো যাবে তার নির্দেশ আছে। পড়লে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে।'

চিঠিটা নিলো কুয়াশা। জানালার সামনে গিয়ে পড়তে লাগলো:

'প্রিয়তমা জেন,

'যে সময় এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছুবে তখন আর আমি বেঁচে থাকবো না। প্রিয়তমা স্ত্রী আর কন্যার মায়া কাটিয়ে চলে যাবো এই পৃথিবী ছেড়ে। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের বিয়েটা না হলে-ই হয়তো ভালো ছিলো। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগতের বাসিন্দা ছিলাম আমরা। আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছি তোমাকে সুখী করার, কিন্তু পারিনি। আমার ধারণা সেজন্যে দায়ী আমিই। জীবনের শেষ সময়ে এসে তাই এর ক্ষতিপূরণ করে যেতে চাই। এই চিঠির সাথে আমার উইলের কপি পাঠাচ্ছি।

'আমি তোমাদের জন্যে কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা করে যেতে পারছি না। আমার মৃত্যুর পর আমার প্রাসাদের উত্তরাধিকারী হবে আমার চাচাতো ভাই কুমার সিং। সেটাই নিয়ম। আমাদের যদি ছেলে থাকতো তাহলে ফালির রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সে-ই হতো। তুমি-ও ছেলের সঙ্গে থাকতে পারতে প্রাসাদে। কিন্তু ছেলে নেই আমার, এখন ফালির রাজ প্রাসাদে ঢুকতে হলেও তোমাকে কুমার সিং-এর অনুমতি নিতে হবে। প্রয়াত রাজার স্ত্রী-কন্যা হিসেবে নির্দিষ্ট অঙ্কের একটা মাসোহারা কেবল পাবে তোমরা। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত কিছু ভূ-সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি তোমাদের জন্যে।

'ভেবো না এই সামান্য মাসোহারার খবর দেয়ার জন্যে এ চিঠি লিখছি আমি। এমন একটা সম্পদের কথা তোমাদের জানাচ্ছি যা উদ্ধার করতে পারলে দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন হয়ে যাবে তুমি। তোমার হয়তো মনে আছে, বিয়ের পরপরই একদিন গোল-কুণ্ডার গুপ্তধনের কথা বলেছিলাম তোমাকে। তোমার আর ঊর্মি-লার জন্যে আমি সেই গুপ্তধন রেখে যাচ্ছি, যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো, সত্যি সত্যিই তোমাদের আমি ভালোবাসতাম।

'আমার উকিল তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবে এ চিঠি। কিভাবে আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি তা-ও জানতে পারবে তার কাছে। শুনে মুষড়ে পোড়ো না। আশা করি বুঝতে চেষ্টা করবে, কি পরিস্থিতি-তে মৃত্যুর জন্যে এমন একটা পথ বেছে নিতে হয়েছে আমাকে। সত্যিই বলছি, জেন, আমি আর বইতে পারছি না এ বোঝা। সারা জীবন যে পাপের বোধ আমাকে তাড়া করে ফিরেছে তা থেকে এক্ষুণি যদি মুক্তি না পাই, হয়তো পাগল হয়ে যাবো।

'থাক সে কথা। এখন শোনো, কিভাবে পৌঁছুবে গোলকুণ্ডার গুপ্তধনের কাছে : সোজা কানওয়ার আশ্রমে চলে যাবে। আশ্রমটা কোথায় নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার ? পুরনো শহরের ঠিক বাইরে। সেখানে গিয়ে প্রধান পুরোহিত আনন্দ রায়ের সঙ্গে কথা বলবে। সে-ই এক মাত্র লোক, যে জানে, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে আমার দেহাবশেষ। আমার সমাধি মন্দিরে পৌঁছার পর দেখবে আমার গলায় ছোট একটা সোনার লকেট রয়েছে। লকেটটা নেবে। এর ভেতরেই রেখে যাচ্ছি গোলকুণ্ডার গুপ্তধনের খোঁজ।

'গোলকুণ্ডার ধনরত্ন সব তোমাদের। ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারো ওগুলো। যদি মানব কল্যাণের জন্যে এর কিছু অংশ ব্যয় করো—অন্যের আনন্দের মাঝে নিজের আনন্দ খুঁজে নিতে চেষ্টা করো, তাহলে হয়তো কিছুটা শান্তি পাবে আমার অপরাধী আত্মা। তবে হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কোনো বাধ্য বাধকতা নেই তোমাদের।

'বিদায়, প্রিয়তমা জেন, বিদায়, মা মণি উর্মিলা।

রাজেন্দ্র সিং।'

চিঠিটা ভাঁজ করে নিঃশব্দে উর্মিলার হাতে ফিরিয়ে দিলো কুয়াশা।

'এখন আমাদের সামনে একটাই মাত্র কাজ,' বললো উর্মিলা, 'কানওয়ারের আশ্রমে গিয়ে আনন্দ রায়কে খুঁজে বের করতে হবে। তার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে যেতে হবে বাবার সমাধিমন্দিরে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুপ্তধন উদ্ধার করে কেটে পড়তে হবে। আজ বিকেলেই রওনা হতে পারি আমরা।'

'পুরনো শহরের রাস্তা চেনো তুমি ?'

'বোধহয়। ছোটবেলার কথা ভালো করে মনে নেই, তবে মারা

যাওয়ার আগে মা এতবার করে বলে গেছে যে কোন পথে গেলে পুরনো শহরের বাইরে পৌঁছুনো যাবে তা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। শেষ দিনগুলোতে মা কেবল ফালির কথা-ই বলতো। বোধহয় বাবার এই চিঠি পেয়ে অনুতাপ জেগেছিলো তার মনে। ভারতে ফিরে আমার—।'

থেমে গেল ঊর্মিলা। ভারি পদশব্দ ভেসে আসছে করিডোর থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর পাশের অর্থাৎ ওর কামরার সামনে থেমে গেল আওয়াজ। কর্কশ কণ্ঠে কি যেন বলছে কারা। ভয়ার্ত চোখে কুয়াশার দিকে তাকালো ঊর্মিলা।

'আমার ঘরে কেউ ঢুকেছে। ওরা হয়তো—।'

'শ্-শ্!'

ঊর্মিলার হাতে মৃদু চাপ দিলো কুয়াশা। তারপর ছুটে গিয়ে তালা লাগিয়ে দিলো দরজায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাতল ধরে ঘোরালো কেউ।

'দরজা খুলুন!'

'কে?' জানতে চাইলো কুয়াশা।

'পুলিস! ফালির রাজা কুমার সিং-এর নামে বলছি, দরজা খুলুন!'

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে কুয়াশার হাত ধরলো ঊর্মিলা।

'মনে হয় ওদের ঠেকাতে পারবো না আমরা,' ফিস ফিস করে বললো ও।

'হুঁ। কিন্তু তার আগে চিঠিটা দাও তো আমাকে!'

ছোঁ মেরে ওটা ওর হাত থেকে নিয়েই বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো কুয়াশা। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বেলে কাগজটার এক

কোণা ধরলো তার ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর কালো ছাই-এ পরিণত হলো রাজেন্দ্র সিং-এর চিঠি। ছাইটুকু কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ টেনে দিলো কুয়াশা। তারপর ফিরে এলো দরজার কাছে। ইতিমধ্যে অধীর হয়ে উঠেছে পুলিস—অবশ্য সত্যিই যদি ওরা পুলিস হয়ে থাকে। ঘন ঘন দরজা ধাক্কাচ্ছে আর চিৎকার করছে। দরজা খুলে দিলো কুয়াশা।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো পুলিসের ইউনিফর্ম পরা ইয়া মোটা এক লোক।

'কি করছেন ভেবে চিন্তে করছেন তো?' কোমল গলায় অথচ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললো কুয়াশা। 'আমরা বিদেশী, আমাদের সাথে ভদ্র আচরণ করা উচিত আপনার, তাই না?'

মাথায় পাগড়ি ঠিক করতে করতে বুক টান করে দাঁড়ালো দারোগা। খেঁকিয়ে উঠলো, 'এতক্ষণ লাগলো কেন দরজা খুলতে?'

কাঁধ ঝাঁকালো কুয়াশা।

'আমি বাথরুমে ছিলাম। বাথরুমে থাকাটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়, না কি বলেন?'

'দেখি, আপনাদের কাগজপত্র দেখি!'

দারোগার কাঁধের উপর দিয়ে তাকালো কুয়াশা। দরজার বাইরে আধ ডজন ইউনিফর্ম পরা লোক দেখতে পেলো। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

'বাহ্, সদলে এসেছেন দেখছি!' কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বললো কুয়াশা।

'আপনাদের কাগজপত্র!' অধীরভাবে আবার হুঙ্কার ছাড়লো দারোগা।

একটা নিশ্বাস ফেলে হিপ-পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করলো কুয়াশা। উর্মিলাও বের করলো তারটা, হাতব্যাগ থেকে। দুটো পাসপোর্টই হাতে নিয়ে সাবধানে পরীক্ষা করলো দারোগা। তারপর ঝটকা মেরে বন্ধ করলো সেগুলো।

'জাল মনে হচ্ছে এগুলো।'

'মিথ্যে কথা!' বললো কুয়াশা। 'ঠিকই আছে পাসপোর্ট দুটো, এবং আপনি তা ভালোই জানেন! ধানাই পানাই রেখে কি জন্যে এসেছেন বলুন।'

'দুঃখিত, আপাতত আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না, মিস্টার আলী। আপনাদের দু'জনকেই আমি গ্রেপ্তার করছি।'

'গ্রেপ্তার করছেন!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো উর্মিলা। 'কেন? কি অপরাধে?'

'গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে আপনার কাছে?' জানতে চাইলো কুয়াশা।

'আমাদের ফালিতে কাউকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পরোয়ানার দরকার করে না। রাজার নির্দেশই যথেষ্ট।'

'আশ্চর্য! আপনারা ভারত সরকারের পুলিস না কুমার সিং-এর?'

'কুমার সিং নয়, বলুন রাজা কুমার সিং। আর আমরা ভারত সরকারের পুলিস না রাজা কুমার সিং-এর সে ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'রাজা!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো উর্মিলা। 'আপনি বলতে চাইছেন আমার কাকা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পাঠিয়েছেন?'

'ঠিক তাই, মিস সিং। এখন দয়া করে আসবেন আমার সঙ্গে?

সত্যিই বলছি ফালির একজন রাজকুমারীর ওপর শক্তি প্রয়োগ করতে খুব খারাপ লাগবে আমাদের।'

'বিদ্রোহী ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালো উর্মিলা। কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললো, কিন্তু বাধা দিলো ওকে কুয়াশা। নিজের জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে হাত রাখলো ওর পিঠে।

'চলো যাওয়া যাক,' বললো ও। 'মনে হচ্ছে এ ছাড়া কোনো উপায় নেই আপাতত। নিশ্চয়ই ভুল করছেন দারোগা সাহেব। যাহোক, তোমার কাকার কাছে গেলে হয়তো এর একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।'

মনে মনে খুব ভালো করে জানে কুয়াশা, মোটেই ভুল করছে না দারোগা, কুমার সিং-এর নির্দেশেই এসেছে সে। তবু উর্মিলাকে একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ও বললো কথাগুলো। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একবার মনে হয়েছিলো আচ্ছা করে পিটুনি লাগায় দারোগা মশাইকে। দরজার বাইরে সিপাইদের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেছে। একটু আশ্চর্য-ও হয়েছে, প্রতিটা সিপাই-এর হাতে সাবমেশিন গান দেখে। সত্যিই এরা পুলিস না কুমার সিং-এর ব্যক্তিগত বাহিনী?

অস্ত্রের মুখে ওদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার পর্যন্ত। কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম নিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে চার প্রহরী। দারোগাকে দেখেই পথ ছেড়ে দিলো তারা। ফটক পেরোলো ওরা। তারপর প্রাসাদের নুড়ি বিছানো রাস্তা, প্রশস্ত রাজপথের মতো চওড়া। একপাশে সযত্নে তৈরি করা চমৎকার বাগান, অন্যপাশে ঝকমকে কৃত্রিম হ্রদ। এগিয়ে চললো ওরা। এক জায়গায় এসে হ্রদের এক চিলতে একটা অংশ

ঢুকে গেছে বাগানের ভেতর। চওড়া একটা কারুকাজ করা সেতুর ওপর দিয়ে জায়গাটা পার হলো ওরা। সেতুর দুপাশেই দুজন করে তলোয়ার এবং বল্লমধারী প্রহরী। হঠাৎ হ্রদের জলে একটা জিনিস নড়তে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল কুয়াশার। ঊর্মিলার হাত ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করলো ও সেদিকে।

'দেখেছো কুমীর?' বললো ও। 'তোমার বাবার আমলে ছিলো ওগুলো?'

'না!' মাথা নাড়লো ঊর্মিলা। 'কখনো শুনিনি তো। কুমীর দিয়ে কি করে ও?'

কাঁধ ঝাঁকালো কুয়াশা।

'কে জানে? অনেকে শখ করে রঙিন মাছ পোষে, তোমার কাকার শখ হয়তো কুমীরে।'

সেতু পার হয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর প্রশস্ত একটা উঠানে পৌঁছুলো ওরা। শ্বেত মর্মর দিয়ে বাঁধানো উঠান। পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোতেও ঝকমক করছে। উঠান পেরোতেই বিশাল প্রাসাদ। প্রাচীন আমলের মোটা মোটা থাম। কারুকাজ করা প্রবেশদ্বার। দুপাশে দুজন বল্লমধারী। ওদের দেখে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিলো প্রহরীরা। দারোগার পেছন পেছন কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে চওড়া একটা করিডোরে পৌঁছুলো ওরা। মোজাইক করা করিডোর ধরে কিছুদূর এগোনোর পর বিরাট একটা হলঘর। কারুকাজ করা প্রাচীন আসবাব পত্র নিখুঁত ভাবে সাজানো। ওরা হল ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে এক দিকের একটা পর্দা সরে গেল। তিনজন লোক ঢুকলো ভেতরে। দুজন নিগ্রো, সবুজ সিল্কের পোশাক পরা। কোমরে খাপে পোরা তলোয়ার। পর্দার কাছে রয়ে

গেল দুজন নিগ্রো। অন্যজন এগিয়ে এলো।

'কুমার সিং,' বিড়বিড় করে বললো উর্মিলা।

শাদা রঙের একটা স্যুট পরে আছে রাজা। মাথায় শাদা পাগড়ি। লোকটা মাঝ বয়সী, একহারা গড়ন, চমৎকার স্বাস্থ্য, সুন্দর করে ছাঁটা চাপ দাড়ি মুখে। চেহারা সুন্দর-ই বলা যেতো, কুতকুতে চোখ দুটোই বাদ সেধেছে।

উর্মিলার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সে। ক্রূর একটা হাসি খেলে গেল তার মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে অপছন্দ করে ফেললো কুয়াশা।

দারোগার দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করলো রাজা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো মোটু। কুয়াশার সামনে এসে বললো, 'দেখি, কি কি জিনিস আছে আপনার কাছে?'

ট্রাউজার, জ্যাকেটের পকেট উল্টে দেখালো কুয়াশা। কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই দেখে সন্তুষ্ট হলো দারোগা। তারপর উর্মিলার সামনে এলো।

'আপনার ব্যাগটাও দেখতে হবে,' বললো সে।

বিরক্তির সঙ্গে হাতব্যাগটা এগিয়ে দিলো উর্মিলা। কিছু পাওয়া গেল না ওটার ভেতরেও।

'নেই কিছু,' রাজার দিকে ফিরে বললো মোটু।

'ঠিক আছে, বুটা সিং, এবার তুমি যাও,' দারোগার দিকে তাকিয়ে বললো রাজা, তারপর ফিরলো উর্মিলার দিকে। 'বাহ্, বেশ সুন্দরী রমণী হয়ে উঠেছো দেখছি ক'বছরেই! শেষবার যখন তোমাকে দেখি তখনো তুমি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে, উর্মিলা। আর এখন সুন্দরী এক মহিলা! খুব সুন্দরী—।'

রাগের সঙ্গে এক পা সামনে এগোলো উর্মিলা।

'আপনার প্রশংসার কোনো দরকার নেই আমার, কুমার সিং, ওগুলো আপনার কাছেই থাক। আমি জানতে চাই, আমাদের ধরে নিয়ে আসা হয়েছে কেন? কোন অপরাধে? যদি ভেবে থাকেন এই করে আপনি পার পেয়ে যাবেন—।'

'প্লিজ, প্লিজ, উর্মিলা!' এক হাত উঁচু করে ওকে থামিয়ে দিলো কুমার সিং। আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠলো তার আঙুলের আংটি-গুলো। 'আগে বসো, তারপর কথা হবে। দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বসে বসে আলাপ করাই কি আরামের নয়?'

নিচু একটা সোফায় পাশাপাশি বসলো কুয়াশা আর উর্মিলা। কুমার সিং-এর জন্যে কারু কাজ-করা, মখমলে মোড়া, পিঠ বাঁকা একটা চেয়ার নিয়ে এলো নিগ্রো প্রহরী দু'জন।

'মহামান্য রাজা সিংহাসনে বসেছেন,' বললো উর্মিলা, স্পষ্ট বিদ্রূপ ওর গলায়। 'এবার দয়া করে বলবেন কি, কেন ধরে আনা হয়েছে আমাদের?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, উর্মিলা।' পায়ের ওপর পা তুলে দিলো রাজা কুমার সিং। হাত দুটো ভাঁজ করে আনলো কোলের ওপর। 'প্রথমত আমি জানতে চাই, ফালিতে ফিরে এলে কেন তুমি? হঠাৎ করে জন্মভূমি দর্শন করার ইচ্ছা হয়েছে আর চলে এসেছো, তা আমি মনে করি না।'

'কেন? না কেন? সবারই জন্মভূমির প্রতি মায়া থাকে।'

'জন্মভূমির প্রতি মায়া, হুঁহ। শোনো, ভাস্তি, দুনিয়াদারির খোঁজ খবর আমিও একটু আধটু রাখি। জন্মভূমি দেখতে আসার সময় কেউ নিরাপত্তার জন্যে লোক ভাড়া করে আনে না।' কুয়াশার

দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো সে।

'অত্যন্ত আপত্তিকর কথা।' রাগের ভান করে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা।

'মিস্টার আলী আমার পুরনো বন্ধু,' বললো ঊর্মিলা, মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে ওর। 'দু'জনে এক সাথে ছুটি কাটানোর জন্যে এসেছি এখানে। খুব বেশি হলে তিন চারদিন থাকবো, তারপর চলে যাবো, এতে আপনার আপত্তি করার কি আছে তা তো বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা, ঊর্মিলা।' কুয়াশার দিকে ফিরলো রাজা। 'আপনি বসুন, মিস্টার আলী। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মিথ্যে কথা বলছো তুমি, ঊর্মিলা। "ফ্লাইং ডাক"-এ ওঠার আগে তুমি কখনো দেখনি মিস্টার আলীকে। বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী উনি। লণ্ডনে এক বিজ্ঞান সম্মেলন শেষে দেশে ফিরছিলেন। কলম্বো থেকে ওঁ বম্বে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা না করে হঠাৎ তোমার সঙ্গে ফালিতে চলে এলেন কেন?' কুতকুতে চোখগুলো আরো সরু করে কুয়াশার দিকে তাকালো কুমার সিং। 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতি প্রেম জেগে উঠেছিলো বলে নয়? তাহলে? নিশ্চয়ই তোমার সাথে আসা কোনো কারণে জরুরি মনে হয়েছে ওঁর কাছে। কি কারণ?' কেউ কোনো জবাব দিলো না। সবজান্তা ভঙ্গিতে মৃদু মাথা ঝাঁকালো রাজা। 'তোমার খোঁজাখুঁজিতে সাহায্য করার জন্যেই উনি এসেছেন, তাই না?'

'কিসের খোঁজাখুঁজি?' আকাশ থেকে পড়লো ঊর্মিলা।

একটা ভুরু সামান্য একটু উঁচু হলো রাজার।

'কিসের, জানো না? বেশির ভাগ লোক যে জিনিসের খোঁজে

থাকে : গুপ্তধন। গোলকুণ্ডার গুপ্তধন।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো উর্মিলা, কিন্তু কুয়াশা ফেটে পড়লো অট্টহাসিতে।

'গুপ্তধন।' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করলো ও। 'নাহ্, আরব্য উপন্যাস মার্কা প্রাসাদে থেকে আপনার মাথাটা একদম গেছে দেখছি! আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করি, কুমার সিং: আজকাল মানুষ আর গুপ্তধন খুঁজতে বেরোয় না. এখন মানুষ মাটির নিচে সোনার চেয়ে দামী ইউরেনিয়াম খোঁজে, নিদেন পক্ষে তরল সোনা তেল। গুপ্তধন খোঁজাটা একেবারে সেকেলে হয়ে গেছে···যাহোক, তবু যদি আপনার মনে হয়, আশপাশে কোথাও গুপ্তধন আছে, আমাদের বলুন, দেখি চেষ্টা করে, উদ্ধার করা যায় কি না।'

'হ্যাঁ, আশেপাশে কোথাও আছে গুপ্তধন, আর তা উদ্ধারের কাজে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন।'

'বেশ বেশ। একটা কথা কিন্তু আগেই বলে নিচ্ছি, কিছু পাওয়া গেলে আধাআধি শেয়ার।'

এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো কুমার সিং।

'আপনার রসবোধের প্রশংসা না করে পারছি না যাহোক।' পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল রাজা। ভুরু কুঁচকে তাকালো উর্মিলার দিকে। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। শোনো, উর্মিলা, আমি জানি তোমার বাপ, গোলকুণ্ডার গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিলো। যে কারণেই হোক, সেগুলো সে তোলেনি, মরার সময় দান করে গেছে তোমাকে আর তোমার ইংরেজ মাকে। কি করে ওগুলো উদ্ধার করা যাবে তা-ও বলে গেছে তোমাদের। এখন তাড়াতাড়ি বলে ফেল, কোথায় পাওয়া যাবে ওগুলো?'

'আপনি কোথা থেকে এত সব খবর পেয়েছেন একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন আর হয়তো পারবেন আপনি,' বললো ঊর্মিলা, 'আমি তো এতকিছু জানি না। গোলকুণ্ডার গুপ্তধনের কথা-ও আজই প্রথম শুনলাম।'

হঠাৎ করেই ভদ্রতার মুখোস খুলে গেল কুমার সিং-এর মুখ থেকে।

'ঊর্মিলা!' চিৎকার করে উঠলো সে। 'আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না!'

'আমিও তা-ই বলছি, আমার ধৈর্যচুতি ঘটিয়েন না।' বললো ঊর্মিলা। 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখানে ধরে আনার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? তারপর আবার কি সব উল্টো-পাল্টা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।'

'কে আবার দেবে, সে অধিকার নিয়ে-ই জন্মেছি আমি। আমি এখানকার শাসনকর্তা, আমার যখন যাকে খুশি ধরে আনতে পারি, যা খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি। আর ঠিক এক মিনিট সময় দেবো তোমাকে, তার ভেতর বলবে কোথায় আছে গুপ্তধন।'

'পাগল হয়ে গেছেন আপনি,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললো ঊর্মিলা।

মুহূর্তের জন্যে একটু যেন অসহায় দেখালো কুমার সিংকে। পর-মুহূর্তে কুয়াশার দিকে ফিরলো সে।

'মিস্টার আলী, আমার ধারণা আমার এই ভাস্তির চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ লোক আপনি। ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না, শক্তি প্রয়োগের আগেই যদি আমার সাথে সহযোগিতা করে তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ করবে ও।'

'ছি ছি, রাজা বাহাদুর,' জবাব দিলো কুয়াশা, 'ওভাবে বলবেন না, লজ্জা পাবে ঊর্মিলা। ও আপনার ভাইয়ের মেয়ে, নিশ্চিয়ই ও

আপনাকে সাহায্য করবে। যদি বলেন, আমিও করবো। কিন্তু তার আগে তো জানতে হবে, কি সাহায্য করবো। বিশ্বাস করুন, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, এক বিন্দু বুঝতে পারিনি আমি।'

'জাহান্নামে যাও, শয়তানের চ্যালারা!'

উঠে দাঁড়িয়ে দুবার তালি বাজালো রাজা। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো দুই নিগ্রো রক্ষী!

'নিচের অন্ধ কুঠুরিতে নিয়ে যাও মেহমানদের। আর সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।'

'আমাদের কি করবেন আপনি?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইলো ঊর্মিলা।

'সামান্য আমোদ-ফুর্তির ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্যে। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। যদি খারাপ লাগে তাহলে একটা মাত্র কথা বোলো, কি কথা সে সময় আপনিই বুঝতে পারবে —তখন অন্য কোনো আমোদের ব্যবস্থা করবো তোমাদের জন্যে।'

'আমোদ ফুর্তির কোনো দরকার নেই আমাদের!' তীব্র গলায় বললো ঊর্মিলা।

তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করলো রাজা।

'কোথায় আছে গুপ্তধন বলো, যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে তোমরা।'

'আবার গুপ্তধন!' মাটিতে পা ঠুকলো ঊর্মিলা। 'পাগল হয়ে যাবো শব্দটা শুনতে শুনতে।'

'নিয়ে যাও এদের,' সবুজ সিল্কে মোড়া দুই রক্ষীর দিকে ফিরে বললো কুমার সিং। 'ওদের জন্যে কি মজার ব্যবস্থা করে রেখেছি দেখলে সহযোগিতা করার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে দুজনেই।'

দুই নিগ্রো রক্ষী টানতে টানতে নিয়ে চললো কুয়াশা আর উর্মিলাকে। পেছন পেছন চললো কুমার সিং। কয়েক বার সিঁড়ি বেয়ে নামতে হলো। প্রতিটা সিঁড়ির ওপরে নিচে সশস্ত্র প্রহরী। তারপর ভেজা ভেজা সরু একটা সুড়ঙ্গ, অস্পষ্ট ভাবে আলোকিত। সুড়ঙ্গের মুখেও সশস্ত্র প্রহরী। পনের বিশ গজ পর পর ইলেট্রিক বাল্ব জ্বলছে সুড়ঙ্গের গায়ে, তবু অন্ধকার দূর হচ্ছে না ঠিকমতো। হঠাৎ ফুটখানেক লম্বা কি যেন একটা সামনে থেকে এসে উর্মিলার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে কুয়াশার হাত খামচে ধরলো ও।

'কিছু না, ইঁদুর.' একটু হেসে কোমল গলায় বললো কুমার সিং। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, আরো অনেক দেখার সৌভাগ্য হবে তোমার ...এবার ডান দিকে, প্লিজ।'

সুড়ঙ্গটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে এখানে এসে। ডান দিকে মোড় নিয়ে চলতে লাগলো ওরা।

দ্রুত চিন্তা চলছে কুয়াশার মস্তিষ্কে। লিন অথবা ফ্যারেলের

সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে নাকি কুমার সিং-এর ? ওরা কি এক সাথে কাজ করছে ? যদি তা-ই হয় তাহলে কে কার হয়ে কাজ করছে ? রাজা লিন-এর হয়ে, না লিন রাজার হয়ে ? একবার দেখেই লিন সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে কুয়াশার, তাতে মনে হয় কারো হয়ে কাজ করার লোক সে নয়। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় কুমার সিং-ই কাজ করছে লিন-এর হয়ে। তাহলে উর্মিলাকে বন্দী করছে কেন সে ? যতক্ষণ না গুপ্তধনের কাছে পৌঁছুচ্ছে ততক্ষণ তো উর্মিলাকে ছেড়ে রাখতেই চায় লিন ? তার আদেশ অমান্য করার সাহস কি রাখে কুমার সিং ? নাকি লিন-এর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই রাজার ? নিজের সূত্রে খবর পেয়েই সে গুপ্তধনের দিকে হাত বাড়িয়েছে ? যদি তা-ই হয়, হয়তো আরো কেউ কেউ জানে, রাজেন্দ্র সিং গোলকুণ্ডার গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিলো। হয়তো উর্মিলাই লণ্ডনের অর্ধেক মহিলাকে জানিয়ে এসেছে কেন ও ভারতে আসছে। হয়তো—

'ব্যস, এসে গেছি আমরা।' কুমার সিং-এর গলা শুনে চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল কুয়াশার।

ভারি একটা লৌহ কপাটের তালা খুললো এক নিগ্রো রক্ষী। কুয়াশা আর উর্মিলার দিকে তাকিয়ে ভেতরে ঢোকার ইশারা করলো কুমার সিং। দরজার গোড়ায় গিয়ে থমকে দাঁড়ালো উর্মিলা। খাড়া এক সারি সিঁড়ি নেমে গেছে ছোট্ট কুঠরিটার মেঝে পর্যন্ত। মেঝেটা ক্রমশ ঢালু হয়ে মিশেছে উল্টো দিকের দেয়ালের সাথে। দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা গোল গর্ত। সরু কোনো সুড়ঙ্গের মুখ সম্ভবত। অন্ধকার। দুই ফুট মতো হবে গর্তটার ব্যাস। মুখে একটা ঝাঁঝরি লাগানো। ছোট একটা বাল্ব

জ্বলছে কুঠুরির ছাদে।

'হ্যাঁ, নামো,' আদেশ করলো কুমার সিং।

ধীরে ধীরে নেমে গেল নিরুপায় উর্মিলা। পেছন পেছন নামলো কুয়াশা। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ভারি লোহার কপাট। তালার ভেতর চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনলো দু'জন। তারপর আরেকটা আওয়াজ। মুখ তুলে তাকালো ওরা। দরজার ওপর দিকে একটা ফোকর মতো খুলে গেছে। এক সেকেণ্ড পর কুমার সিং-এর মুখ দেখা গেল সেখানে। ঝকঝকে শাদা দাঁত বের করে হাসছে। শিকার মুঠোয় পেলে হিংস্র পশুর চেহারা বোধহয় এমন নয়।

'আমাদের এখানে আটকে রাখছো কেন?' চিৎকার করলো উর্মিলা। 'কখন ছাড়বে?'

'ছি, উর্মিলা, কাকার সাথে অমন অভদ্রভাবে কথা বলতে হয় না। কখন ছাড়বো জানতে চাইছো? সেটা তোমার ওপরই নির্ভর করছে। ভদ্র মেয়ের মতো, আমার ভাস্তির মতো যদি আমার সাথে সহযোগিতা করো তাহলে এক্ষুণি ছেড়ে দেবো, চাও যদি আমার মেহমান হিসেবে প্রাসাদেও কাটিয়ে যেতে পারো কয়েকটা দিন।'

'কক্ষণো না!' সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উর্মিলা। কাকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'কক্ষণো না। শুনে রাখো, শয়তান, কক্ষণো আমি সহযোগিতা করবো না তোমার সাথে।'

'বেশ···বেশ, উর্মিলা। সেক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখাতে চাই তোমাকে। পেছন ফিরে তাকাও। ওপাশের দেয়ালে একটা গর্ত দেখছো? ওটা আসলে একটা পাইপ, প্রায় পনর গজ লম্বা, পাশের আর একটা কুঠুরিতে বেরিয়েছে ওটার অন্য মাথা।'

'তাতে কি?'

'পাশের কুঠুরিতে চমৎকার কিছু পোষা প্রাণী আছে আমার। গর্তের মুখে ঐ ঝাঁঝরিটা দেখছো? ওটা খুলে নিলেই ওরা আরামে চলে আসতে পারবে তোমাদের কুঠুরিতে। তারপর ওদের সাথে তোমরা ইচ্ছে হলে ভাব-ও জমাতে পারো, ইচ্ছে হলে লড়াই-ও করতে পারো। ও, আরেকটা কথা, ঐ ঝাঁঝরিটা কিন্তু বাইরে থেকেই আমি খুলে দিতে পারি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ঊর্মিলা।

'কি—কি প্রাণী আছে ঐ কুঠুরিতে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করলো সে।

'কুমীর। গত কয়েক দিন ধরে না খাইয়ে রাখা হয়েছে ওদের। ঝাঁঝরি খুলে নিয়ে পানি ছেড়ে দেবো, ধীরে ধীরে পানি বাড়তে থাকবে তোমাদের কুঠুরিতে, সেই সাথে হাজির হবে কুমীরগুলোও। সত্যি কথা বলতে কি, ঊর্মিলা, আমি চাই না, এমনভাবে কারো মৃত্যু ঘটুক। কিন্তু কি করবো বলো, তুমি যেমন ঘাড় বাঁকিয়ে আছো, এছাড়া কোনো উপায়-ও নেই আমার।' একটু থামলো রাজা কুমার সিং। তারপর আবার বললো, 'এর ভেতর যদি মত বদলাও, দরজার পাশে ঐ শিকলটা ধরে টান দিও, আমি জানতে পারবো, তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে।'

কুয়াশার দিকে তাকালো ঊর্মিলা। একটা ভুরু সামান্য উঁচু করে কাঁধ ঝাঁকালো কুয়াশা।

'তুমি যা জানতে চাইছো তা আমাদের জানা নেই,' দৃঢ় গলায় বললো ঊর্মিলা।

'ঠিক আছে, যদি হঠাৎ করে জেনে ফেল তাহলে টান দিও শিকলে। আমি তাহলে যাই, হ্যাঁ? মনে রেখো, পানি আসতে

শুরু করার পর বেশিক্ষণ লাগবে না কুমীরদের পৌঁছুতে।'

দুই নিগ্রো ভৃত্যকে নিয়ে চলে গেল কুমার সিং। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গের ওপাশে মিলিয়ে গেল তাদের পায়ের আওয়াজ। গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো ছোট্ট কুঠুরিটায়। অনেকক্ষণ পর ঊর্মিলা এগিয়ে এসে একটা হাত ধরলো কুয়াশার, যেন নির্ভরতা খুঁজছে।

'ওর কথাগুলো বিশ্বাস হয়েছে তোমার?' কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো ও।

ভুরু কুঁচকে তাকালো কুয়াশা। কুমার সিং-এর কথা যে ও বিশ্বাস করেছে তা নয়, আবার অবিশ্বাস করেছে তা-ও নয়। গোলকুণ্ডার গুপ্তধন কোথায় আছে জানতে না পারলে নিঃসন্দেহে লোকটা কুমীর দিয়ে খাওয়াবে ঊর্মিলাকে—অন্তত চেষ্টা করবে। তবে আশার কথা একটাই, ঊর্মিলাকে মেরে ফেললে গুপ্তধন পাওয়ার আশা শেষ হয়ে যাবে কুমার সিং এর। সুতরাং নিজের গরজেই সে চাইবে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে। সত্যি কথাই বললো ওকে কুয়াশা।

'অবিশ্বাস করার কিছু দেখছি না। তবে আমার মনে হয়, ভয় দেখানোর জন্যেই তোমার কাকা বলেছে ওসব। কুমীর দিয়ে যদি খাইয়ে-ই ফেলে, গুপ্তধন পাবে কি করে? যতক্ষণ না ও জানতে পারছে কোথায় আছে ওগুলো ততক্ষণ কিছুই করবে না।'

'যদি—যদি আমরা বলে দিই কোথায় আছে ওগুলো, তাহলে? তাহলে কি ছেড়ে দেবে আমাদের?'

'মনে হয় না। একবার গুপ্তধন হাতে পেলে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ওর কাছে।'

'বলতে চাও আমাদের খুন করবে ও?'

'করলে আশ্চর্য হবো না।'

'তাহলে—তাহলে কি করবো আমরা ?'

কাঁধ ঝাঁকালো কুয়াশা।

'আপাতত অপেক্ষা। তারপর দেখা যাক কি হয়। চোখ কান খোলা রাখলে পালানোর একটা পথ হয় তো পেয়ে যাবো।'

পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সের চেয়ে সামান্য বড় একটা বাক্স বের করে সিঁড়ির ওপর বসলো ও। জিনিসটা মিনি আলট্রাসোনিক বক্স। কুয়াশার সাথে সব সময় থাকে একটা। কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই শুনেই সন্তুষ্ট হয়েছিলো মোটু দারোগা। ওদের সব জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছিলো, ফলে মিনি আলট্রাসোনিক বক্সটা রয়ে গেছে ওর পকেটে। এটার সাহায্যে অনায়াসে দরজার তালা কেটে বেরিয়ে যেতে পারে ওরা। কিন্তু তারপর ? এই কুঠুরি থেকে বেরুতে পারা মানেই কি পালাতে পারা ? ঢোকার মুখে প্রাসাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা দেখেছে তাতে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালানো খুবই দুরূহ একটা ব্যাপার। প্রতিটা কোণায় সশস্ত্র প্রহরী দেখেছে ও। মিনি আলট্রাসোনিক বক্স দিয়ে ছোটখাটো কাজ করা সম্ভব, এতগুলো প্রহরীকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তার ওপর রয়েছে ঊর্মিলা। ওর নিরাপত্তার দিকটা প্রথমেই ভাবতে হবে কুয়াশাকে। একা থাকলে সমস্যা ছিলো না, কোনো না কোনো একটা উপায় ঠিকই করে ফেলতো পালানোর।

ঊর্মিলার উদ্বিগ্ন গলা শুনে সচেতন হলো কুয়াশা। খামচে ধরেছে মেয়েটা ওর বাহু।

'ও কিসের শব্দ, কুয়াশা ?'

মুখ তুলে উল্টো দিকের দেয়ালের দিকে তাকালো কুয়াশা।

'পানি আসতে শুরু করেছে,' নির্বিকার গলায় বললো ও।

'তার মানে ও ভয় দেখায়নি—সত্যি সত্যিই কুমীর দিয়ে খাওয়াতে চায় আমাদের!'

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে।'

ঊর্মিলার কাঁধের ওপর হাত রাখলো কুয়াশা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো কাঁপছে মেয়েটা।

'আরে তুমি দেখি কাঁপছো! এত ভয় পাওয়ার কি আছে, হ্যাঁ? আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, পালানোর কিছু একটা উপায় ঠিকই করে ফেলবো।'

দুঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে, সিঁড়ির ওপর বসে আছে ওরা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, একটু একটু করে বাড়ছে পানি। দেয়ালের গায়ে সেই গর্তটা দিয়েই আসছে। প্রথম দশ মিনিটে ভেসে যায় পুরো মেঝেটা। তারপর থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে বাড়ছে। কুঠুরির মেঝে থেকে দরজার উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। ইতিমধ্যে চার ফুট ডুবে গেছে পানিতে। দেয়ালের গায়ে সেই গর্তটার মুখ আর মাত্র দু'ইঞ্চি ওপরে। একটু একটু করে পানি বেড়েছে আর ওরা এক ধাপ এক ধাপ করে ওপরে উঠেছে। আর একটা মাত্র ধাপ বাকি। কুমীরগুলো এখনো এলো না কেন বুঝতে পারছে না কুয়াশা। ভাঁওতা দিয়েছে কুমার সিং? মনে হয় না। প্রাসাদে ঢোকার সময় ওরা হ্রদে কুমীর দেখেছে। হ্রদের কুমীর সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এই কুঠুরিতে পাঠিয়ে দেয়া কঠিন কিছু না। যা-ই হোক, কুমীরের চেহারা দেখা মাত্র মিনি আলট্রাসোনিক বক্স ব্যবহার করবে ও। প্রথমে দরজার তালাটা গলাবে, তারপর বেরিয়ে গিয়ে দেখবে পালানো যায় কি না।

আর এগোলো না ওর চিন্তা। ঊর্মিলার গলা শুনতে পেলো।

'শেষ সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে পানি !'

'দেখেছি,' সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বললো কুয়াশা।

'আমি টান দিচ্ছি শেকলে।' দরজার কোণার দিকে হাত বাড়ালো উর্মিলা। 'জাহান্নামে যাক গুপ্তধন।'

'থামো, উর্মিলা !

হাত বাড়িয়ে ধরলো ওকে কুয়াশা। টেনে আনলো নিজের দিকে।

'সেদিন না কত বড়াই করছিলে, মরতে রাজি তবু কাউকে দেবে না ওগুলো ? অত অস্থির হয়ো না। আমি তো বলেছি, কিছু একটা উপায় ঠিকই করে ফেলবো বেরোনোর। আমরা ভেঙে পড়ি তা-ই তো চাইছে কুমার সিং।'

'আমি ভেঙে পড়েছি। সত্যি বলছি, আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারবো না এ আতঙ্ক।'

'আর একটু সহ্য করো। দেখি সত্যি সত্যি কুমীর আসে কি না। যদি না আসে তাহলে ঐ গর্তের ভেতর দিয়েই হয়তো পাশের হ্রদে গিয়ে উঠতে পারবো। সাঁতার জানো তো ?'

'তা জানি। কিন্তু সত্যিই যদি কুমীর আসে ? তা ছাড়া হ্রদেও তো কুমীর আছে।'

'কুমীর যদি আসেই, অন্য একটা উপায়ের কথাও ভেবেছি। সেই একই উপায়ে হ্রদের কুমীরকেও সামাল দেয়া—।'

আর কিছু শুনতে পেলো না উর্মিলা। প্রাসাদের বাইরে কোথাও তীব্র এক রক্তহিম করা চিৎকার উঠলো। কুয়াশার ভারি গলা চাপা পড়ে গেল তার তলে। ছোট্ট কুঠুরির দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরতে লাগলো শব্দটা। পরমুহূর্তে আরেকটা চিৎকার। একই

রকম রক্তহিম করা। এটা আরো কাছে, সম্ভবত প্রাসাদের ভেতরে। তারপর আরেকটা এবং আরেকটা। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে চিৎকারের আওয়াজ। কাঁপতে কাঁপতে কুয়াশার হাত আঁকড়ে ধরলো উর্মিলা।

'ও কি?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো ও।

'আল্লা মালুম।'

আর কিছু বলতে পারলো না কুয়াশা। আবার চালু হয়ে গেছে ওর মস্তিষ্ক। এখনো সমানে ভেসে আসছে আর্তনাদ, ওর মনেও হানা দিয়েছে প্রশ্নটা—কি ও? সন্দেহ নেই মরণ যন্ত্রণায় চিৎকার করছে কেউ। কিন্তু কে? কোনো অবাধ্য প্রজাকে শাস্তি দিচ্ছে কুমার সিং? কিন্তু আওয়াজ শুনে তো মনে হচ্ছে, বহু লোক এক সাথে আক্রান্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেলো ওর মাথায়—কুমার সিং-এর প্রাসাদ আক্রমণ করেছে কেউ? প্রজারা ক্ষেপে উঠে একজোট হয়ে হামলা চালিয়েছে?

এই সময় আরেকটা আর্তচিৎকার শুনতে পেলো কুয়াশা। নারী-কণ্ঠে, এবং একেবারে পাশে।

'আবার কি হলো, উর্মিলা?' জিজ্ঞেস করলো ও।

গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না মেয়েটার। কাঁপা কাঁপা হাত তুলে ইশারা করলো শুধু।

উর্মিলার ইশারা অনুসরণ করে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলো কুয়াশা। মিনি আলট্রাসোনিক বক্সটা চলে এসেছে হাতে। উল্টো দিকের দেয়ালের গায়ে সেই গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বিরাট এক কুমীর। পেছনে আরো একটা, সবে মাত্র মাথা বের করেছে গর্ত থেকে।

'শিকল ধরে টানো, কুয়াশা!' আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করলো উর্মিলা। 'কুমার সিংকে ডাকো!'

'ঠিক আছে, তুমি একটু চুপ করে দাঁড়াও আমি দেখছি কি করা যায়।'

কুয়াশার গায়ের সাথে সেঁটে এলো উর্মিলা। দ্বিতীয় কুমীরটাও ঢুকে পড়েছে কুঠুরিতে, আরেকটার মাথা দেখা যাচ্ছে গর্তের মুখে।

'কই টানলে না শিকল!' অস্থির ভাবে বললো উর্মিলা।

না, শিকল টানলো না কুয়াশা। মিনি আলট্রাসোনিক বক্সটার ওপর দুটো বোতাম, একটা লাল একটা শাদা। লালটা সামান্য টানলো ও। এবার শাদা বোতামটা ঘোরালেই অদৃশ্য আলট্রাসোনিক তরঙ্গ ধীরে ধীরে কেটে ফেলবে দরজার তালা লাগানো অংশ। বোতামটা ঘোরাতে যাবে কুয়াশা, এমন সময় ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল দরজার বাইরে। তালায় চাবি ঢোকালো কেউ। তারপরই চাবি ঘোরানোর শব্দ। চকিতের জন্যে দরজার ওপর দিককার ফোকরে একটা মুখ দেখতে পেলো কুয়াশা। তারপর আবার ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ। দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে।

শাদা বোতামটা না ঘুরিয়ে দরজায় ঠেলা দিলো কুয়াশা। খুলে গেল লোহার কপাট। এক ঝটকায় উর্মিলাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলো ও কুঠুরির বাইরে। প্রথম কুমীরটা তখন পৌঁছে গেছে সিঁড়ির গোড়ায়; দানবীয় চোয়াল দুটো একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে। আর আধ সেকেণ্ড সময় পেলেই কামড়ে ধরতে পারতো উর্মিলার পা।

'উহু, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!' লাল বোতামটা জায়গা মতো

বসিয়ে মিনি আলট্রাসোনিক বক্সটা পকেটে রাখতে রাখতে বললো কুয়াশা।

মাথা ঝাঁকালো উর্মিলা।

'ও বোধহয় সারাক্ষণ ঐ ফোকরে চোখ লাগিয়ে ছিলো। মজা দেখছিলো। যখন—।'

'কে?'

'কে আবার? আমার কাকা কুমার সিং।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লো কুয়াশা। 'ও কুমার সিং নয়।'

'তাহলে?'

'মুহূর্তের জন্যে হলেও মুখটা দেখেছি আমি। মনে হলো লিন।'

'লিন! লিন এখানে কি করবে? আর লিন আমাদের ছেড়ে দেবেই বা কেন?'

'লিন-ই তো ছেড়ে দেবে। ও চায় আমরা মানে তুমি-ই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও গুপ্তধনের কাছে। তুমি বন্দী থাকলে কি করে তা সম্ভব?'

'বুঝলাম, কিন্তু ও এই প্রাসাদে ঢুকলো কি করে?'

'সেটা অবশ্য বলতে পারছি না এ মুহূর্তে। দেখি উপরে উঠে, জানা যায় কি না।'

প্রায় অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠলো। একটা করিডোর পেরোতেই প্রাসাদের সামনের দিককার সেই বিরাট হল ঘরটায় পৌঁছুলো। আশ্চর্য, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে প্রাসাদটা। ওদের যখন নিচে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যে সব জায়গায় প্রহরীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো সে জায়গাগুলো এখন ফাঁকা। বিরাট হলঘরের ঝাড়-

বাতিটা নিভে আছে। অনুজ্জ্বল দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব কোনো জ্বলছে। আরো আশ্চর্য হলো কুয়াশা। সম্ভবত প্রাসাদের প্রধান হলঘর এটা, সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, এ সময় এমন মিটমিটে আলো থাকার কথা না তো এ ঘরে! পা টিপে টিপে এগোলো ওরা হলঘরের ভেতর দিয়ে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, এত সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে প্রাসাদ থেকে।

হঠাৎ নরম একটা কিছুতে পা বাধলো কুয়াশার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিচের দিকে তাকালো ও। নিস্পন্দ একটা কালো দেহের ওপর দৃষ্টি পড়লো। কুমার সিং-এর দুই নিগ্রো ভৃত্যের একজন। তলোয়ারটা খোলা পড়ে আছে পাশে।

'কি হয়েছে ওর?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো উর্মিলা।

হাঁটু গেড়ে বসলো কুয়াশা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো আবার।

'মরে গেছে,' বললো ও। 'ছুরি মারা হয়েছে পিঠে।'

চমকে নিচে তাকালো উর্মিলা। ধীরে ধীরে প্রথমে অবিশ্বাস তারপর আতঙ্ক ফুটে উঠলো চোখে। হঠাৎ হাসতে শুরু করলো ও। নার্ভাস, হিস্টিরিয়া আক্রান্ত লোকের মতো হাসি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই ফুঁপিয়ে উঠে কাঁদতে শুরু করলো উর্মিলা। তাড়াতাড়ি দুহাতে ধরলো ওকে কুয়াশা। ইতিমধ্যে আবার হাসতে শুরু করেছে উর্মিলা। ওর দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলো কুয়াশা। প্রথমে আস্তে। কিন্তু থামলো না ওর হাসি-কান্না। এবার জোরে ঝাঁকুনি দিলো কুয়াশা।

'কি হলো, উর্মিলা! অমন কোরো না, প্লিজ। এখনই যদি এমন ভেঙে পড়ো তাহলে সামনে কি করবে?'

ঝাঁকুনি খেয়েও কোনো উন্নতি হলো না উর্মিলার। একই রকম ফোঁপাতে ফোঁপাতে কেঁদে হেসে চললো। এখন হাতের কাছে এক বালতি ঠাণ্ডা পানি থাকলে নির্ঘাৎ ওর মাথায় ঢেলে দিতো কুয়াশা। যেহেতু নেই, একমাত্র জানা উপায়টা প্রয়োগ করলো। মাঝারি শক্তির একটা চড় লাগালো উর্মিলার গালে।

এবার কাজ হলো। চড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল উর্মিলা। পর মুহূর্তে ফুঁসে উঠলো।

'এত বড় সাহস তো-তোমার?' মেঝেতে পা ঠুকে বললো ও।

'দুঃখিত, উর্মিলা,' বললো কুয়াশা। 'এমন অসুস্থের মতো আচরণ করছিলে তুমি, আর কোনো উপায় ছিলো না আমার। এবার দয়া করে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো। আবার বিপদে পড়ার আগেই কেটে পড়তে হবে এখান থেকে।'

'মাফ করে দাও আমাকে,' চোখের পানি মুছতে মুছতে বললো উর্মিলা। 'জীবনে এই প্রথম ছুরি খেয়ে মরা মানুষ দেখলাম। তাই চট করে ধাক্কাটা সামলাতে পারিনি। আর কখনো এমন হবে না।'

উর্মিলার হাত ধরে হলঘরের বাইরে এলো কুয়াশা। তারপর করিডোর পেরিয়ে প্রাসাদের বাইরে। উঠোন পেরোনোর সময় আরো তিনটে মৃতদেহ দেখলো ওরা। দু'জনের বুকে গেঁথে আছে বর্শা, তৃতীয় জনের পিঠে ছুরি। কুয়াশার হাত ধরে কাঁপতে কাঁপতে জায়গাটা পেরোলো উর্মিলা। একবারও তাকালো না মৃতদেহ-গুলোর দিকে।

'ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না,' ভুরু কুঁচকে বললো কুয়াশা। 'বাড়িটাকে কসাইখানা বানানোর জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো

কে? ফালির জনসাধারণ রাতারাতি তোমার চাচার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে, ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না। তাহলে—।' থেমে গেল ও। উর্মিলার হাতটা আরেকটু শক্ত করে ধরলো। 'ঐ যে আরেকটা লাশ।'

ইতিমধ্যে একটু বোধহয় সামলে নিতে পেরেছে উর্মিলা।

'মনে হচ্ছে কুমার সিং,' বললো ও। 'পিঠে ছুরি মারা হয়েছে।'

উর্মিলাকে ছেড়ে দিয়ে কুয়াশা এগিয়ে গেল মৃতদেহটার দিকে। ঝুঁকে পরীক্ষা করলো। নাড়ী ধরেই বুঝলো মারা গেছে কুমার-সিং। এখন আর কিছু করতে পারবে না সে, তার জন্যেও কিছু করার নেই ওদের। হঠাৎ কি মনে হতে কুমার সিং-এর পকেটে হাত ঢোকালো কুয়াশা। গুলিভর্তি একটা অটোমেটিক ঠেকলো হাতে। ঝট পট ওটা বের করে এনে পকেটে ভরলো। তারপর উর্মিলার কাছে ফিরে এসে ওর হাত ধরে ছুটলো ফটকের দিকে।

হ্রদ পেরোনোর সেতুটার ওপর উঠলো ওরা। প্রহরী চারজন মরে পড়ে আছে যেখানে ছিলো সেখানে। ভালো করে একবার চারদিকে তাকালো কুয়াশা। বিশেষ মনোযোগের সাথে দেখলো বাগানের দিকটা। জীবিত কোনো কিছুর ছায়া ও নজরে পড়লো না। কিন্তু তবু, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর: দেখা না গেলেও মনে হচ্ছে কারা যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে বাগানের ভেতর। তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখছে ওদের ওপর। কুমার সিং-এর পকেট থেকে বের করে নেয়া পিস্তলটা ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নেই ওদের কাছে, কিন্তু শত্রু যে পুরোমাত্রায় সশস্ত্র এবং ভয়ঙ্কর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিনি আলট্রাসোনিক বক্সটাকেও অবশ্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সমস্যা আছে একটা, শত্রু যদি খুব কাছা-

কাছি থাকে তবেই অস্ত্রটা কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু সে সুযোগ কি পাওয়া যাবে ?

সেতু পেরিয়ে নুড়ি বিছানো পথ ধরে ছুটলো ওরা। ওদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই চারদিকে। হঠাৎ আগের মতো সেই রক্তহিম করা একটা আর্তনাদে খান খান হয়ে গেল নিস্তব্ধতা। একটা শব্দও বেরোলো না উর্মিলার গলা দিয়ে, কুয়াশার হাত খামচে ধরলো শুধু। মানুষ বা পশু যা-ই হোক না কেন, জীবিত কিছুর গলা দিয়ে এমন প্রাণ কাঁপানো শব্দ বেরোতে পারে, কিছুতেই বিশ্বাস হলো না ওর। দীর্ঘ একটানা আওয়াজটা নিচু হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়।

কুয়াশার গায়ের সাথে সেঁটে এসেছে উর্মিলা। আবার থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে বেচারা। গতি একটুও না কমিয়ে উর্মিলার হাত ধরে ছুটে চললো কুয়াশা।

মিনিট খানেকের-ও কম সময়ের ভেতর প্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে পড়লো ওরা। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কুমার সিং-এর ফটক রক্ষীরা। চারজনেরই বুকে গেঁথে আছে ভোজালি। বর্শাগুলো পড়ে আছে পাশে। তিন সেকেণ্ডের ভেতর প্রাসাদ এলাকার বাইরে চলে এলো ওরা।

কোন দিকে যাবে ভাবছে কুয়াশা। এমন সময় ওর হাত ধরে টানলো উর্মিলা।

'কি ?' জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'ঐ দেখ !'

উর্মিলার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো কুয়াশা। দেখলো লেটেস্ট মডেলের শাদা একটা কনভার্টিব্‌ল দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদ প্রাচীরের

পাশে। একটা দরজা খোলা। অবাক হবে না শঙ্কিত হবে ঠিক বুঝতে পারলো না ও। মনে হচ্ছে গাড়ির ভেতরটা ফাঁকা। তবু সাবধানের মার নেই, পিস্তল হাতে গুটি গুটি পায়ে এগোলো ও। পেছন থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখলো, সত্যিই কেউ নেই গাড়িতে। তাহলে দরজা খোলা কেন? আরো অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, চাবি লাগানো রয়েছে গাড়িটার ইগনিশনে।

আর কোনো ভাবাভাবি নেই, মনে মনে বললো কুয়াশা। উর্মিলার দিকে তাকিয়ে গাড়ির কাছে আসার ইশারা করলো তারপর খোলা দরজা দিয়ে উঠে বসলো ড্রাইভিং সিটে।

ছুটে এলো উর্মিলা।

'কি করছো?' সন্ত্রস্ত ওর গলা।

'তাড়াতাড়ি ওঠো, এক্ষুণি ভাগতে হবে এখান থেকে।' হাত বাড়িয়ে পাশের দরজাটা খুলে দিলো কুয়াশা।

'কার গাড়ি এটা? চুরির দায়ে ফেঁসে যাবো না?'

'সে দেখা যাবে, এখন ওঠো তো। আর এক মুহূর্ত থাকতে চাই না এখানে।'

আট

'বুঝতে পারছি না, এটা এখানে এলো কি করে ?' কনভার্টিব্‌ল-এ উঠতে উঠতে বললো উর্মিলা। 'কেমন অদ্ভুত না ঘটনাটা ?—দরজা খোলা, চাবি লাগানো ইগনিশনে ! আর দেখ—' ড্যাশ-বোর্ডে আঁকা একটা সোনালী মনোগ্রামের দিকে ইশারা করলো ও, 'কে. এস.···নিশ্চয়ই কুমার সিং-এর গাড়ি এটা। কিন্তু ও তো মারা গেছে। কি করে ও—।'

'ও না।' চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো কুয়াশা। গিয়ার বদলে ক্লাচ ছাড়তে ছাড়তে বললো, 'একটু যেন দিনের আলো দেখতে শুরু করেছি। আমাদের মুক্ত করেছে যে, সে-ই গাড়িটা এখানে এনে রেখেছে। আমাদের জন্যেই, যেন নিশ্চিন্তে পালাতে পারি আমরা।'

'কিন্তু কে ? কুমার সিং যে আমাদের ধরে এনেছে তা কেউ জানে না। সুতরাং কে আসবে আমাদের মুক্ত করতে ? আর, কেন ?'

'আমাদের প্রতি প্রেম বশতঃ যে নয়, সে ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'মানে ?'

'মানে ? আমরা মুক্ত থাকলে কার সবচেয়ে সুবিধা ? আমরা পথ দেখিয়ে গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাবো তা কে চাইছে ?'

'লিন !'

'ঠিক তাই। বললাম না, আমি মুহূর্তের জন্যে হলেও দরজার ফোকরে লিন-এর মুখ দেখেছি। কুমার সিং-এর সাথে লিন-এর কোনো যোগাযোগ ছিলো কিনা জানি না। থাক না থাক, কিছু আসে যায় না, তোমার কাকা চেয়েছিলো একাই বাজিমাৎ করতে। লিন সেটা টের পেয়ে এগিয়ে এসে আমাদের উদ্ধার করেছে। অর্থাৎ এখন আমরা লিন-এর হাতের পুতুল। ও যেভাবে চাইবে ঠিক সেভাবেই চলতে হবে আমাদের। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলে ভেবো না সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে আমাদের লিন। খাঁচাটা একটু বড় করে দিয়েছে কেবল, যেন মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা করতে পারে আমাদের স্বভাব চরিত্র, গতিবিধি। আমার ধারণা, এ মুহূর্তেও ওর চররা নজর রাখছে আমাদের ওপর।'

একটু পরেই কুয়াশার কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো।

শক্তিশালী হেডলাইটের আলোয় রাতের অন্ধকার চিরে এগিয়ে চলেছে কনভার্টিব্‌ল। তীক্ষ্ণ চোখে কুয়াশা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। রাস্তার দু'পাশে ছোট বড় নানা আকারের ঝোপ। হঠাৎ একটা ঝোপের ভেতর গুঁড়ি মেরে থাকা একটা মূর্তি নজরে পড়লো ওর। লোকটা ভারতীয়। কোমরের কাছে শাদা একটা কাপড় জড়ানো, এছাড়া পুরো শরীর উলঙ্গ। হেডলাইটের আলোয় ঝিক করে উঠলো তার হাতে ধরা বিরাট একটা ছোরা।

ঝোপটার কাছে পৌঁছে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করলো কুয়াশা। ডান

হাতে পকেট থেকে অটোমেটিকটা বের করে উঁচু করলো সামান্য।

'এই! তুমি!' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হিন্দিতে চেঁচালো ও। 'এদিকে এসো তো, দুটো কথা বলি তোমার সঙ্গে!'

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। এক মুহূর্ত পরে শোনা গেল সেই অদ্ভুত প্রাণ কাঁপানো চিৎকার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই রকম চিৎকারে ভেসে এলো একটা জবাব।

চিৎকারের রহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো কুয়াশার কাছে।

'সংকেত দেয়ার জন্যে আরেকটু মধুর কোনো আওয়াজ বেছে নিতে পারলে না বাবারা!' হাল্কা গলায় বললো ও।

'কুমার সিং আর তার লোকদের যারা মেরেছে তাদের একজন ও?' জিজ্ঞেস করলো ঊর্মিলা।

'সম্ভবত।'

হেডলাইট নিভিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কুয়াশা। তারপর জ্বাললো আবার। কিন্তু আর দেখা গেল না লোকটাকে।

'হোটেলে ফিরে যাওয়া-ই বোধহয় ভালো,' পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বললো কুয়াশা। 'তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে কাল দিনের আলোয় যা করার করা যাবে।'

হাঁ-না কিছু বললো না ঊর্মিলা। গাড়ি ঘুরিয়ে যে পথে এসেছে সে পথে রওনা হলো কুয়াশা। কয়েক মিনিট লাগলো প্রাসাদের গেটে পৌঁছুতে। চকিতে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলো, রক্ষী চারজনের মৃতদেহ তেমনি পড়ে আছে।

প্রাসাদ-ফটকের ঠিক বাইরে বড় একটা বাঁধানো চত্বর। চত্বর পেরিয়ে ডানে মোড় নিয়ে শ'দুয়েক গজ গেলেই ওদের হোটেল।

হোটেলের সামনে গাড়ি থামালো কুয়াশা। আশপাশ [illegible]। লাগছে জায়গাটা। ডোরম্যান বা বয়-বেয়ারা কারুরই দেখা [illegible]। ওপরে নিচে প্রতিটা ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু একটা লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কেমন একটা ভৌতিক পরিবেশ।

গাড়ি থামতেই নেমে পড়লো ঊর্মিলা। ছুটলো হোটেলের দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই একটা আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে।

এদিকে গাড়ি থেকে নেমে কুয়াশা-ও এগিয়েছে দরজার দিকে। পিস্তলটা গুঁজে নিয়েছে কোমরে। ঊর্মিলার চিৎকার শুনে ছুটে গেল ও।

'কি হলো ?'

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ও দেখতে পেলো জিনিসটা : দরজার সাথে গেঁথে আছে একটা ছুরি, এখনো রক্তে ভেজা।

'ওহ, আর কতক্ষণ দেখতে হবে এই দুঃস্বপ্ন ? সব কি উন্মাদ হয়ে গেছে ?'

এগিয়ে দরজার হাতল ঘোরালো কুয়াশা।

'তালা মারা,' গম্ভীর গলায় বললো ও। 'গুপ্তধন না পাওয়া পর্যন্ত বোধহয় আমাদের স্বস্তি দেবে না লিন !'

দরজার কড়া ধরে সর্বশক্তিতে নাড়লো ঊর্মিলা। কলিং বেল টিপলো। একটানা অনেকক্ষণ টিপে ধরে রাখলো। তালা মারা হাতলটা ঘোরানোর চেষ্টা করলো কিছুক্ষণ। অবশেষে লাথি মার-লো কয়েকবার বন্ধ দরজায়। খোলা তো দূরের কথা, ভেতর থেকে সাড়াও দিলো না কেউ। দুঃখে ক্ষোভে দুচোখ বেয়ে জল নেমে এসেছে বেচারার। মাথা নাড়লো কুয়াশা।

'লাভ নেই, উর্মিলা,' বললো ও। 'কি করে কাজ আদায় করতে হয় তা বোধহয় ভালোই জানে আমাদের বন্ধু, লিন। হোটেলে তালা মেরে রেখেছে, এদিকে আমাদেরকে গাড়ি দিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি ? হয় পালাতে পারি নয়তো গুপ্তধনের কাছে যেতে পারি। পালানোর পথও সম্ভবত বন্ধ করে রেখেছে ও। তাহলে—।'

'কিন্তু কি করে ?' অস্থিরভাবে বললো উর্মিলা। 'হোটেলে আরো লোক ছিলো না ? তাদের কি করেছে ?'

'জানি না, হয় খেদিয়ে দিয়েছে, নয় মেরে ফেলেছে। লিন যদি ইচ্ছে করে, আমার ধারণা, পুরো ফালি দখল করে নিতে পারে যে কোনো সময়। যাহোক, চলো এবার, তোমার পুরোহিতের কাছে যাওয়া যাক।'

'এখন ? এই রাতে ? লিন আর ফ্যারেলকে পেছনে নিয়ে ?'

'উপায় কি ? এখানে এই বারান্দায় বসে থাকবে ?'

'পুলিসের কাছে যেতে পারি আমরা—'

'পুলিস ! পাগল নাকি ? মনে নেই পুলিসই আমাদের তুলে দিয়েছিলো কুমার সিং-এর হাতে ? তাছাড়া ফালিতে কোনো পুলিসের অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা কে জানে ? আমার তো মনে হয় পুলিস স্টেশন-ও দখল করে নিয়েছে লিন-এর লোকরা।'

'তোমার কি মনে হয় সত্যিই আমাদের ওপর চোখ রাখা হচ্ছে ?'

'কোনো সন্দেহ নেই।'

এক মুহূর্ত ভাবলো উর্মিলা। তারপর কুয়াশার হাত আঁকড়ে ধরে নেমে এলো বারান্দা থেকে।

'চলো আমরা পালিয়ে যাই, কুয়াশা !' বললো ও। 'জাহান্নামে

যাক গোলকুণ্ডার গুপ্তধন। কেন যে বাবা খুঁজে পেয়েছিলো ওগুলো! নিজে তো ডুবেছি-ই, তোমাকেও টেনে এনেছি এই বিপদের ভেতর। আমাকে মাফ করে দাও কুয়াশা। সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি এমন বিপদের ভেতর এসে পড়বো। গাড়িটা তো রয়েছে, চলো ফুলস্পীডে চালিয়ে চলে যাই অন্য কোথাও, লোকালয়ে।'

পালানোর কথা ভুলেও ভাবছে না কুয়াশা। জীবনে কখনো বিপদের ভয়ে পিছু হটেনি ও। আজ-ও সে প্রশ্ন ওঠে না। অতীতে বহুবার লিন-এর চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী লোকের মোকাবেলা করেছে ও, অনেক ক্ষেত্রে খালি হাতেই এবং একা একা। অবশ্য আজকের ঘটনাটা একটু অন্য ধরনের, মেয়েটা রয়েছে সাথে। ওর নিরাপত্তার দিকটা ভাবতে হবে ওকে। ভেবে রেখেছে-ও একটা। এখন ঐ পুরোহিত বাবার কাছে যেতে পারলেই হয়। এসব কথা ঊর্মিলাকে বললো না ও।

'শোনো, ঊর্মিলা, এই লোকগুলোকে ছোট করে ভাবছো তুমি,' অবুঝ একটা বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বললো কুয়াশা। 'পালানোর প্রশ্নই আসে না। কারণ, প্রথমতঃ ওরা ভালো করেই জানে, গাড়ির ফুয়েল ট্যাঙ্কের অর্ধেকও ভর্তি নয়। কোনোমতে যদি ফালি থেকে বেরোতে-ও পারি, পথে থামতে হবে তেলের জন্যে —চিন্তা করে দেখ, এই রাত দুপুরে কে তেল নিয়ে বসে আছে আমাদের জন্যে? তাছাড়া আমরা ফালি থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে লিন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে আমাদের ধরার জন্যে। বিশেষ কিছু করতে হবে না, আরেকটা গাড়িতে আমাদের পেছন পেছন আসলেই হবে। আমাদের তেল শেষ হওয়া মাত্র ধরে ফেলবে ওরা। আমাদের সাথে অস্ত্র বলতে সবেধন নীলমণি একটা

পিস্তল—কতক্ষণ টিকতে পারবো ওদের সঙ্গে ?'

ঠোঁট কামড়ালো উর্মিলা।

'সেক্ষেত্রে একটা কাজই করতে পারি আমি,' বললো ও, 'ফ্যারেল বা লিন যাকেই পাওয়া যায়, বলে দেবো, কোথায় আছে ওগুলো।'

'তা-ও তুমি করতে পারছো না, গুপ্তধন কোথায় আছে তা তুমি জানো না। তুমি শুধু এটুকু বলতে পারো, তোমার বাবার সমাধি মন্দিরে তাঁর গলায় যে লকেট আছে তাতে পাওয়া যাবে গুপ্তধনের হদিস, বাবার সমাধি মন্দির কোথায় তা জানা যাবে কি করে ? কানওয়ার মঠের এক পুরোহিতের কাছে। তখন ওরা কি করবে ? বেচারা পুরোহিতকে গিয়ে ধরবে—ইতিমধ্যে আমাদের কিন্তু ছেড়ে দেবে না ওরা, যতক্ষণ না গুপ্তধন হাতে পাচ্ছে ততক্ষণ ছাড়বে না আমাদের—যাহোক, তখন পুরোহিত কি করবে ? গড় গড় করে বলে দেবে, কোথায় রাজেন্দ্র সিং-এর সমাধি মন্দির ? আমার মনে হয়, না। তা-ই যদি হতো তাহলে শুধু ঐ পুরোহিত নয়, আরো অনেককেই তোমার বাবা বলে যেতেন, কোথায় গিয়ে আত্মহত্যা করছেন তিনি। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে ? পেট থেকে কথা বের করার জন্যে ওরা খামোকা নির্যাতন করবে নিরীহ পুরোহিতকে। সেটাই কি তুমি চাও ?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলো না উর্মিলা।

'একটা কাজই আমরা করতে পারি,' বলে চললো কুয়াশা, 'তাহলো, আপাতত ওদের তালে তাল মিলিয়ে চলা। শেষ মুহূর্তে হয়তো দর কষাকষির একটা সুযোগ পেয়ে যাবো।'

'কি দর কষাকষি করবে ?'

'এখন কি করে বলবো ? পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে সেটা।

তেমন মওকা পেলে গুপ্তধন আধাআধি শেয়ার করার প্রস্তাব দেবো, নিদেন পক্ষে পুরো গুপ্তধনের বিনিময়ে আমাদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব।'

'তুমি সত্যিই মনে করো ওরা কথা রাখবে?'

'আশা করতে দোষ কি? যাহোক, আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই, চলো কানওয়ার মঠে। কি যেন নাম পুরোহিতের?'

'আনন্দ রায়,' নির্বিকার গলায় বললো উর্মিলা।

'হ্যাঁ, এই আনন্দ রায়-ই এখন আসল লোক। কি মনে হয়, পারবে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে?'

'প্রাসাদের সামনে পৌঁছে ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে যেতে হবে। মাইল পনেরো যাওয়ার পর হাতের ডানে পড়বে মঠ, তারপরই শুরু হয়েছে পুরনো শহর,' একই রকম নির্বিকার এক-ঘেয়ে গলায় বলে গেল উর্মিলা।

'চমৎকার!' ছুটলো কুয়াশা গাড়ির দিকে। দরজা খুলে ওঠার ইশারা করলো উর্মিলাকে।

অবসন্ন ভঙ্গিতে ধীর পায়ে হেঁটে এলো মেয়েটা। উঠে বসলো গাড়িতে। দরজা বন্ধ করে উল্টো দিকের দরজা দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠলো কুয়াশা। তারপর ছেড়ে দিলো গাড়ি।

গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই দীর্ঘ রক্তহিম করা চিৎকার। এক মুহূর্ত পরে দূর থেকে ভেসে এলো জবাব। ওদের রওনা হওয়ার সংবাদ চলে গেল লিন-এর কাছে।

প্রাসাদের সামনে বাঁধানো চত্বরে পৌঁছুলো গাড়ি।

'ডানে,' আপন মনে বললো উর্মিলা। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, কুয়াশা, বুকের ভেতর ছুরি ঢুকে গেলে

কেমন লাগে ?'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকালো কুয়াশা। 'কি আবোল তাবোল বকছো তুমি, ঊর্মিলা ? কখনো আমার বুকে ছুরি ঢোকেনি, নিকট ভবিষ্যতে ঢুকবে-ও না। আর আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোমার বুকেও ঢুকবে না। এবার দয়া করে একটু চুপ করে বোসো তো।'

চুপ করলো ঊর্মিলা। তবে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে মাত্র।

'আসার আগে ভাবছিলাম, কত সহজেই না ধনরত্নগুলো নিয়ে ফিরে যাবো,' তিক্ত হেসে বললো ও। 'এখন বুঝতে পারছি, কি কঠিন একটা কাজে হাত দিয়েছি! তুমি যখন বললে বিপদ ঘটতে পারে তখন ভেবেছিলাম একটু উত্তেজনার খোরাক হয়তো পাওয়া যাবে। এখন দেখছি···।'

বাক্যটা শেষ করলো না ঊর্মিলা। কুয়াশার মুখের দিকে তাকালো একবার। তারপর একটু ইতস্তত করে যোগ করলো, 'কোনোমতে যদি বেঁচে ফিরতে পারি, আর কখনো এমন কাজে পা বাড়াবো না। ঘরে বসে উল বুনবো, সে-ও ভালো···ওহ্, ওদের সেই চিৎকারগুলো! কলজে ধরে টান দেয় একেবারে!'

মিনিট দশেক মসৃণ পাকা রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে এলো ওরা। তারপরই রাস্তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করলো। আরো মিনিট পাঁচেক পর গাড়ির গতি ঘণ্টায় দশ মাইলে নামিয়ে আনতে হলো কুয়াশাকে। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে পথ। এখানে ওখানে গর্ত, কোথাও কোথাও ছোট বড় পাথরের চাঁই। দুপাশে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সমভূমি। অদ্ভুত লাল এক ধরনের কাঁকরে গঠিত এলাকাটা। পরপর দুটো শুকনো নদী পেরোলো ওরা। এক বিন্দু জল নেই নদীগুলোয়। বর্ষায় এই নদীগুলোই কানায় কানায় ভরে

যায় পানিতে। আরো কিছুক্ষণ পর এক জায়গায় অনেকগুলো ডুমুর গাছের ঝোপ মতো দেখা গেল। বিশাল একটা বট গাছ।

'ঐ তো!' হঠাৎ সামনে আঙুল তুলে বলে উঠলো ঊর্মিলা। 'দেখ, পুরনো শহর।'

বিশাল একটা পাথুরে স্তূপের ওপর প্রাচীন ধাঁচের দালানের অবয়ব দেখতে পেলো কুয়াশা। প্রথম দর্শনে মনে হলো শহরটা জীবন্ত। কিন্তু আর একটু এগোতেই আগাছা আর ঝোপ-ঝাড়ের আধিক্য দেখে বুঝতে পারলো, বহুদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে এই শহর।

'ঐ যে, কানওয়ার মঠ।' ডান দিকে ইশারা করলো ঊর্মিলা।

একটু সরু তবে একই রকম এবড়ো খেবড়ো একটা পথ চলে গেছে ডান দিকে। গাড়ি চলাচলের জন্যে যে এ রাস্তা তৈরি করা হয়নি সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রইলো না কুয়াশার। মোড় নিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চললো কনভার্টিব্‌ল। মিনিট-খানেক লাগলো মঠের সীমানা প্রাচীরের কাছে পৌঁছুতে।

'ঐ যে, ওখানে একটা গেট দেখা যাচ্ছে,' বললো ঊর্মিলা।

গেটের সামনে গাড়ি থামালো কুয়াশা। বেশ উঁচু প্রাচীর, ভেতরের কিছু বাইরে থেকে দেখা যায় না। গাড়ি থেকে নেমে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। ঠেলা দিয়ে দেখলো ভেতর থেকে বন্ধ। হাতের উল্টোদিক দিয়ে আঘাত করলো কুয়াশা। রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল উঁচু শব্দে। গেটের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে তাকালো ঊর্মিলা। মার্বল পাথরে তৈরি মঠটা চাঁদের মৃদু আলোয় নিরেট একটা স্তূপের মতো লাগছে।

সামনের দরজায় ঘা মেরে চলেছে কুয়াশা। প্রায় দু'মিনিট পর

মঠের একটা দরজা খুলে যেতে দেখলো উর্মিলা। প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এলো এক যুবক : কামানো মাথা, শাদা ধুতি আর ফুতুয়ার মতো একটা পোশাক পরনে।

'সন্ন্যাসীদের একজন,' বললো উর্মিলা। 'কে জানে আনন্দ রায়-ই কিনা ?'

গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী। উঁচু করে ধরলো হাতের প্রদীপ।

'কে এত রাতে দরজা ধাক্কায় ?' হিন্দুস্তানী ভাষায় জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি রাজেন্দ্র সিং-এর মেয়ে,' একই ভাষায় জবাব দিলো উর্মিলা। 'স্বামী আনন্দ রায়ের সাথে দেখা করতে চাই। খুব জরুরি দরকার।'

উর্মিলাকে হিন্দুস্তানী ভাষায় কথা বলতে শুনে বেশ অবাক হলো কুয়াশা। ছোটবেলা থেকে ইংল্যাণ্ডে মানুষ হয়েছে সে, এ ভাষা শিখলো কোথায় ?

'রাজা রাজেন্দ্র সিং-এর মেয়ে !' একটু আশ্চর্য শোনালো সন্ন্যাসীর গলা। 'এত রাতে কোত্থেকে এলেন ? এখানে কেন ?'

'বললাম তো স্বামীজির সাথে দেখা করতে চাই। খুব জরুরি দরকার।'

'খুব ভালো লোক ছিলো আপনার বাবা। একটু দাঁড়ান আমি জিজ্ঞেস করে আসি, স্বামীজি পাঠ বন্ধ করে আপনার সাথে কথা বলবেন কিনা।'

যে পথে এসেছিলো সে পথে ফিরে গেল সন্ন্যাসী। কুয়াশার দিকে ফিরলো উর্মিলা।

'ডাকতে গেল আনন্দ রায়কে।'

'শুনলাম। আচ্ছা, উর্মিলা, তুমি হিন্দুস্তানী ভাষা শিখলে কোথায়?'

'মা'র কাছে। মা যে ক'বছর এখানে ছিলো সে ক'বছরে ভালোই রপ্ত করেছিলো ভাষাটা।'

'হুঁ।'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। মাঝে মাঝে দূর কোথাও থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের হুক্কা-হুয়া। এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই চরাচরে।

'ফিরে আসছে ও,' ফিস ফিস করে বললো উর্মিলা।

আবার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী। গেটের পাশে ছোট একটা তাক মতো জায়গায় প্রদীপটা রাখলো। তারপর বিরাট একটা প্রাচীন আদলের চাবি ঢোকালো তালায়। নিঃশব্দে খুলে গেল তালা। এক পাশে সরে গেল একটা কপাট। এটাও নিঃশব্দে। কব্জাগুলোয় নিয়মিত তেল দেয়া হয় বোধহয়, ভাবলো কুয়াশা।

'আসুন আপনারা,' বললো সন্ন্যাসী। 'স্বামীজি অপেক্ষা করছেন আপনাদের জন্যে।'

গেট পেরিয়ে মঠের চত্বরে ঢুকলো কুয়াশা আর উর্মিলা। গেটের কাছেই পড়ে রইলো কুমার সিং-এর কনভার্টিব্‌ল। দরজা বন্ধ করে আবার তালা লাগিয়ে দিলো সন্ন্যাসী। তারপর প্রদীপটা তুলে নিয়ে এগোলো মূল মঠ ভবনের দিকে। চত্বর পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এলো ওরা। এই দরজা খুলেই বেরিয়েছিলো সন্ন্যাসী। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই আমূল পাল্টে গেল পরি-

বেশ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ছাড়িয়ে দূরে কোথাও যেন চলে এসেছে ওরা। সারি সারি প্রতিমা সাজানো সামনে। ধূপের মিষ্টি গন্ধ চারপাশে। আপনা থেকেই পুত পবিত্র একটা ভাব চলে আসে মনে।

আবার একটা তাকের ওপর প্রদীপ রেখে দরজা বন্ধ করলো সন্ন্যাসী। তারপর কুয়াশা আর ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো পেছন পেছন আসতে।

প্রতিমাগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোলো ওরা। বিশাল কামরাটার ওপাশে আরেকটা দরজা। খোলা। সেই দরজা পেরিয়ে একটা সরু করিডোরে পৌঁছুলো। করিডোরের শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজা। ওটার সামনে গিয়ে থামলো সন্ন্যাসী। মৃদু টোকা দিলো কপাটে।

'ভেতরে এসো!' গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর সাড়া দিলো ভেতর থেকে।

আস্তে ঠেলা দিলো সন্ন্যাসী। সামনের ফটক যেমন খুলেছিলো, তেমন নিঃশব্দে সরে গেল কপাট। এক পাশে একটু সরে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী। ভেতরে ঢুকলো ঊর্মিলা, পেছন পেছন কুয়াশা।

ছোট্ট একটা কুঠুরি। দেয়ালগুলো শাদা, চুনকাম করা। কোনো আসবাবপত্র নেই ঘরে। একটা মাত্র শতরঞ্চি পাতা মেঝেতে, শতরঞ্চির ওপর কাপড় দিয়ে মোড়া কয়েকটা তুলার গদি। কাঠ খোদাই করে বানানো শিবের ছোট্ট একটা মূর্তি ঘরের এক কোণায়। মূর্তির সামনে ছোট্ট একটা ধূপদানী। ধূপ পুড়ছে তাতে। মৃদু সৌরভে ভরে উঠেছে কুঠুরি। শতরঞ্চির মাঝখানে একটা প্রদীপ। প্রদীপের পেছনে বসে বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী। খালি গা, শুধু ধুতি পরনে। পথ প্রদর্শক সন্ন্যাসীর মতো মাথা কামানো এঁর-ও।

মোটাসোটা একটা পুঁথি লোকটার সামনে। ওরা ঢুকতেই তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

'এসো,' উর্মিলার দিকে তাকিয়ে ভারি অথচ অত্যন্ত প্রাণবন্ত গলায় বললেন সন্ন্যাসী। 'বসো। আমি আনন্দ রায়।'

একটু এগিয়ে শতরঞ্চির ওপর দুটো গদিতে বসলো ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল তরুণ সন্ন্যাসী। বৃদ্ধ আনন্দ রায়, কুয়াশা আর উর্মিলা কেবল রইলো ঘরে। নিজের পরিচয় দিলো উর্মিলা।

'আমি উর্মিলা সিং, আর ইনি কুয়াশা, নামকরা বিজ্ঞানী।'

মৃদু হাসলেন আনন্দ রায়।

'হ্যাঁ, তোমার কথা মনে আছে আমার, উর্মিলা। শেষবার যখন দেখেছি তখন তুমি শিশু, তবু মনে আছে। তোমার চোখ দুটো এখনো সেই ছোটবেলার মতোই আছে, একটুও বদলায়নি। তোমাদের দু'জনকেই স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের মঠে।' একটু থামলেন আনন্দ রায়, তারপর আবার বললেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছি, তুমি আসবে।'

সরাসরি কাজের কথায় এলো উর্মিলা।

'মারা যাওয়ার ঠিক আগে লণ্ডনে মা'র কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন বাবা—।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন আনন্দ রায়। 'জানি। তোমার বাবা চিঠিটা দেখিয়েছিলো আমাকে। তুমি বা তোমার মা যদি আসো এখানে, আমার সাধ্যমতো তোমাদের সাহায্য করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তোমার বাবাকে।'

'মা মারা গেছে,' বললো উর্মিলা।

শান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন সন্ন্যাসী।

'আমি তোমাকে সহানুভূতি জানাবো না, উর্মিলা। মৃত্যু প্রকৃতিরই একটা অমোঘ বিধান, জীবন চক্রের একটা অংশ। আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে। যেদিন জন্ম নিয়েছি সেদিন থেকেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। এটাই প্রকৃতির বিধান। একে বদলানো অসম্ভব।' থামলেন বৃদ্ধ। 'আমি অপেক্ষা করছিলাম, উর্মিলা, কবে তুমি আসবে আমার কাছে। জানতাম একদিন আমাকে জানানো হবে, সদর দরজায় অপেক্ষা করছো তুমি। কিন্তু, মা, আসবার জন্যে এমন একটা রাত কেন বেছে নিলে? এখন তো অশুভ আত্মারা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে।'

বৃদ্ধের কথা শেষ হতে না হতেই মঠের বাইরে কোথাও থেকে ভেসে এলো তীক্ষ্ণ দীর্ঘ একটা চিৎকার। ওটা শেষ হতে না হতেই দূর থেকে ভেসে এলো আরেকটা চিৎকার। তারপরই আরো একটা, আরো দূর থেকে। কান খাড়া করে শুনলো আনন্দ রায়। তারপর ফিরলো অতিথিদের দিকে।

'শুনেছো?'

আবার শোনা গেল চিৎকারের আওয়াজ। একের পর এক, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। একটা থামতেই আর একটা শুরু হচ্ছে। কাঠ হয়ে বসে রইলো উর্মিলা। কুয়াশা একটু নড়েচড়ে বসলো। কেবলমাত্র আনন্দ রায়ের ভেতরেই কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কঠোর যোগ সাধনার মাধ্যমে দেহ ও মনকে অবিচল রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন তিনি।

'অশুভ আত্মারা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে,' আবার উচ্চারণ করলেন তিনি।

'চিৎকারগুলো,' একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা, 'আসলে কি ওগুলো ?'

চোখ উঁচু করে নিচের প্রতিমাটার দিকে তাকালেন আনন্দ রায়। চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিচু, ধীর গলায় বললেন, 'ওগুলো ঠগীদের ডাক, মিস্টার কুয়াশা।'

নয়

'ঠগীদের ডাক ?' ভুরু কুঁচকে তাকালো কুয়াশা। 'ঠগী মানে সেই ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতরা, কালীর উপাসক ?'

'ঠিক তাই,' গম্ভীর গলায় বললেন আনন্দ রায়। 'ভারতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা, সব জায়গায় আছে ওরা।'

'কিন্তু আমার তো ধারণা ছিলো বহুদিন আগে নির্মূল হয়ে গেছে ওরা।'

'নির্মূল হয়ে গেছে ? না, কুয়াশা। হলে ভালোই হতো। কিন্তু হয়নি, কিছুদিনের জন্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলো শুধু। সময় সুযোগ বুঝে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।'

'কিন্তু, পুলিস কি করছে ?'

'পুলিস ?' করুণ ভাবে একটু হাসলেন বৃদ্ধ। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, পুলিসের ভেতর যদি ওদের লোক থাকে তাহলে ? আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ইটালিতে যেমন মাফিয়াদের নির্মূল করা পুলিসের সাধ্যের বাইরে, তেমনি ভারতেও ঠগীদের নির্মূল করা পুলিসের অসাধ্য। সেনাবাহিনী নিয়োগ করলে-ও লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ফালির মতো একটা নিরীহ জায়গায় ওদের উপদ্রব শুরু হলো কেন ?'

'আমি বোধহয় জানি কারণটা,' বললো কুয়াশা। 'লিন-এর নাম শুনেছেন আপনি ?'

'লিন ?'

নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে একটু যেন কেঁপে গেল বৃদ্ধ পুরোহিতের গলা।

'হ্যাঁ, লিন নামের একজনের কথা শুনেছি বটে। তিব্বতী, মঙ্গোল-ও হতে পারে—আসলে যে লোকটার জাত কি কেউ জানে না। কামানো মাথা, ভয় ধরানো চাউনি চোখে—।'

'হ্যাঁ, এই লোকই,' সায় দিলো কুয়াশা।

চরম হতাশার ভঙ্গিতে দু'চোখ বন্ধ করলেন আনন্দ রায়। একটু যেন শিউরে উঠলো তাঁর শরীর।

'ভাবছিলাম, হয়তো অন্য কারো কথা বলছেন,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি।

'কেন ? কি জানেন আপনি লিন সম্পর্কে ?'

'এ তল্লাটের সবাই যা জানে তাই। খুব কম লোকেই তার চেহারা দেখেছে, কিন্তু সবাই জানে তার সম্পর্কে। ভয়ঙ্কর লোক। যেমন নিষ্ঠুর তেমন অর্থলোলুপ। অর্থের জন্যে ও পারে না এমন

কোনো কাজ নেই। এশিয়ার দেশগুলোয় ওর অবাধ যাতায়াত। কখন কোন নামে, কোন দেশের নাগরিক হিশেবে কোন দেশে ঢুকবে, কিছু ঠিক নেই।'

কথাটা শুনলো বটে, তবে খুব একটা গুরুত্ব দিতে পারলো না কুয়াশা। এতই যদি দোর্দণ্ড প্রতাপ লোক হবে লিন তাহলে বহু আগেই তার সাথে মোলাকাত হতো ওর। অন্তত বাংলাদেশে এখনো তেমন অবাধ বিচরণ শুরু হয়নি লিনের।

'আচ্ছা, লোকটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'নেহায়েত ক্রিমিন্যাল না অন্য কিছু?'

'আমি যতটুকু জানি তাতে ক্রিমিন্যাল ছাড়া আর কিছু বলতে চাই না ওকে। পেছনে আর কিছু আছে কি না জানি না। যা হোক, হঠাৎ এ লোক সম্পর্কে এত জিজ্ঞাসাবাদের কারণ? আর ঠগীদের সাথেই বা ওর সম্পর্ক কি?'

'এ মুহূর্তে আমাদের—আমাদের বললে অবশ্য ভুল বলা হবে, মিস উর্মিলা সিং-এর এক নম্বর শত্রু এই লিন। আর ওগুলো যদি সত্যিই ঠগীদের চিৎকার হয় তাহলে বলতে হবে লিনকে সাহায্য করছে ওরা।'

কুয়াশার চোখে চোখ রাখলেন আনন্দ রায়। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে একটু।

'কেন? উর্মিলার মতো মেয়েকে শত্রু ভাববে কেন লিন?'

'বহুমূল্য একটা গুপ্তধনের খোঁজ জানে উর্মিলা, তাই।'

সংক্ষেপে 'ফ্লাইং ডাক'-এ উর্মিলার সঙ্গে পরিচয় হওয়া থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বললো কুয়াশা—কলম্বোয় ফ্যারেলকে অনুসরণ করে লিন-এর আস্তানায় পৌঁছানো, ফালির

হোটেল থেকে পুলিস পাঠিয়ে ওদেরকে কুমার সিং-এর ধরে নিয়ে যাওয়া এবং লিন-এর সাহায্যে আবার মুক্তি পাওয়া—সব।'

'বুঝতে পারছি ঠগীরা প্রাসাদ দখল করে ভেতরে যাকে যাকে পেয়েছে সবাইকে খুন করেছে,' সব শেষে যোগ করলো কুয়াশা, 'রাজা থেকে শুরু করে প্রহরী পর্যন্ত কাউকে বাদ দেয়নি। কিন্তু এই লিন লোকটা ঠগীদের দলে টানলো কি করে? ঠগীরা তো নিছক খুনে ডাকাত নয়, ওদের একটা ধর্মীয় আদর্শ আছে!'

'তা আছে,' স্বীকার করলেন আনন্দ রায়। 'সম্ভবত ঐ ধর্মের দোহাই দিয়েই ওদের দলে টেনেছে লিন। হয়তো বুঝিয়েছে, ও একজন নিবেদিতপ্রাণ কালীউপাসক। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে, হঠাৎ এত অনুগ্রহ দেখালো কেন লিন? তোমাদেরকে প্রাণ নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরোতে দিলো কি ভেবে? লিন-এর চরিত্রের সঙ্গে কিছুতেই মিলছে না।'

'অনুগ্রহ নয়,' ঝাঁঝের সাথে বললো উর্মিলা। 'কুয়াশার মতে গভীর একটা ষড়যন্ত্রের অংশ এটা।'

'এখনো আমি তাই মনে করি,' বললো কুয়াশা। 'সেজন্যেই ঠগীরা আমাদের অনুসরণ করে এসেছে এ পর্যন্ত। আমি বলছি, ইচ্ছে হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, পুরো মঠটা এখন ঘেরাও করে রেখেছে ওরা।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু তোমাদের ছেড়ে দিলো কেন ও? আর যদি দিলোই এখনো পেছনে লেগে আছে কেন?'

'খুবই সহজ: কোনো না কোনো ভাবে লিন জেনেছে, গোল-কুণ্ডার গুপ্তধন কি করে উদ্ধার করা যাবে তা মেয়েকে জানিয়ে গেছে রাজেন্দ্র সিং। যতক্ষণ উর্মিলা জীবিত থাকবে ততক্ষণও তাকে নিয়ে

যেতে পারবে সেখানে। সে কারণেই কুমার সিং-এর হাত থেকে ওকে বাঁচিয়েছে লিন। নিঃসন্দেহে ফালিতে ওর চর ছিলো। তার মারফত যে মুহূর্তে খবর পেয়েছে উর্মিলাকে ধরে নিয়ে গেছে কুমার সিং, তখনই ছুটে এসেছে ওকে মুক্ত করতে। গাড়ি দিয়ে এবং হোটেলে ঢুকতে না দিয়ে সে এটাই বোঝাতে চেয়েছে, আমাদের সামনে এখন একটাই করণীয়, গুপ্তধন উদ্ধারে যাওয়া। এ মুহূর্তে পুরো ফালি তার নিয়ন্ত্রণে, লিন ভালো করেই জানে এ অবস্থা খুব বেশিক্ষণ থাকবে না, আগে হোক পরে হোক সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, সুতরাং তার আগেই ধনরত্নগুলো হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়তে চাইছে ও।'

'ধরো আমরা চুপচাপ বসে রইলাম এখানে?' বললো উর্মিলা। 'যতক্ষণ আমরা মঠের ভেতরে আছি ততক্ষণ আমাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না ও।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বললো কুয়াশা। 'আমার ধারণা, খুব বেশি হলে আর এক বা দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করবে লিন। তারপরও যদি আমরা এখান থেকে না নড়ি নির্ঘাৎ ও হামলা চালাবে মঠে।'

উদ্বিগ্ন চোখে আনন্দ রায়ের দিকে তাকালো উর্মিলা।

'আপনি কি বলেন, স্বামীজি? একটা ধর্মীয় আশ্রমে হামলা চালানোর সাহস পাবে পশুটা?'

'আমার মনে হয় কুয়াশা ঠিকই বলেছে,' মাথাটা একটু কাত করে বললেন আনন্দ রায়। 'সত্যি কথা বলতে কি, এতক্ষণ তোমাদের সাথে আলাপ করে যা বুঝতে পারছি, গোলকুণ্ডার গুপ্তধন হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের ছাড়বে না লিন।'

'কিন্তু কুয়াশা তো বলছে, গুপ্তধন হাতে পেলেই লিন খুন করবে আমাদের!' অস্থিরভাবে বললো ঊর্মিলা।

'সেক্ষেত্রে,' শান্ত কোমল গলায় বললেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, 'অনন্ত শান্তির সন্ধান পাবে তোমরা। মৃত্যুকে ভয় পেতে নেই, ঊর্মিলা।'

'কিন্তু আমি পাচ্ছি!' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো মেয়েটা। 'আমি মরতে চাই না, কিছুতেই চাই না!'

'বেশ, তোমাকে মরতে হবে না,' শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললো কুয়াশা। 'এখন দয়া করে শোনো আমি কি বলছি—।'

একই রকম অস্থির দৃষ্টিতে তাকালো ঊর্মিলা ওর দিকে।

'একটা মাত্র পথই এখন খোলা আছে আমাদের সামনে,' বললো কুয়াশা।

'কি?'

লাফিয়ে উঠলো ঊর্মিলা। একটু হেসে মাথা নাড়লো কুয়াশা।

'অত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। ঐ ঠগীরা যেমন মাঝে মাঝে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, এখন থেকে তুমিও তেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি ততক্ষণ লক্ষ্মী মেয়ের মতো স্বামীজির কাছে বসে থাকবে তুমি।'

'কেন? তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

'গুপ্তধন উদ্ধার করতে। দর কষাকষির চেষ্টা করবো লিন-এর সাথে, যদি কিছু ভাগ পাওয়া যায়। লাভ হলে ভালো, না হলে আর কি? সবটাই তুলে দেবো ওর হাতে।' পরিহাসতরল গলা কুয়াশার।

উঠে দাঁড়ালো ও। পায়চারি করতে করতে বলে চললো, 'আমি এখান থেকে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে ছুটবে

আমার পেছন পেছন, এই ফাঁকে কিছুটা নিরাপদে রইবে তুমি। নিঃসন্দেহে আমিই আগে পৌঁছুবো গুপ্তধনের কাছে। লিনও পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের ভেতর। তারপর দেখা যাক কি হয়। পারলে বাগিয়ে আনবো কিছু সোনা দানা। না পারলে ঝেড়ে দৌড়। সোজা এখানে এসে তোমাকে নিয়ে ছুটবো হায়দ্রাবাদের দিকে।'

'একটু বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায় না?' গম্ভীর গলায় বললেন আনন্দ রায়।

কাঁধ ঝাঁকালো কুয়াশা।

'হলেও এছাড়া উপায় তো নেই।'

'তাহলে আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে,' হঠাৎ উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো ঊর্মিলা।

'এক মিনিট, ঊর্মিলা,' হাত উঁচু করে ওকে থামিয়ে দিলো কুয়াশা। 'যতটুকু মনে পড়ছে, তোমার আর আমার ভেতর একটা চুক্তি হয়েছিলো যে, সিদ্ধান্ত আমিই নেবো, তুমি তর্ক না করে নির্দেশ মতো কাজ করবে শুধু, মনে আছে আশা করি। এখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, স্বামীজির সাথে মঠে থাকবে তুমি, আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ অপেক্ষা করবে।'

'যদি তুমি ফিরে না আসো?' কাঁদ কাঁদ গলায় জিজ্ঞেস করলো ঊর্মিলা।

মৃদু হাসলো কুয়াশা।

'ফিরে আমি আসবোই। তোমাকে তো বলেছি, জীবনে এর-চেয়ে অনেক কঠিন বিপদের মোকাবেলা করেছি আমি, এবং একা-ধিকবার। ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই, ঠিকই আমি ফিরে আসবো।'

ঘাড় বাঁকা করে কুয়াশার দিকে তাকালো উর্মিলা।

'না, আমি যাবো। কিছুতেই তুমি আমাকে রেখে যেতে পারবে না।'

'শোনো, উর্মিলা,' দৃঢ় গলায় বললো কুয়াশা 'একটু বুঝতে চেষ্টা করো, আমি একা থাকলে যত সহজে পালিয়ে আসতে পারবো, দুজন থাকলে তা সম্ভব হবে না। হয়তো দুজনেই মারা পড়বো। লিন-এর ঠ্যাঙাড়েরা যদি হামলা চালায়, তুমি থাকলে তোমাকে বাঁচাবো না নিজেকে বাঁচাবো?' বসে উর্মিলার কাঁধে হাত রাখলো ও। 'শোনো, মেয়ে, মোটেই মন খারাপ করো না, আমি জানি তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও বলেই যেতে চাইছো। কিন্তু ভেবে দেখো, তুমি গেলে সাহায্যের চেয়ে যদি অসুবিধা বেশি হয়, তার চেয়ে না যাওয়া-ই কি ভালো নয়? আমি তো বলছি, আমার ওপর ভরসা রাখো, আমি ঠিক ফিরে আসবো, এবং গুপ্তধন নিয়েই। তুমি গেলে শুধু শুধু ঝামেলা হবে। তার চেয়ে তুমি এখানে অপেক্ষা করবে, কেমন?'

'আমরা দু'জনে এখানে বসে বসে প্রার্থনা করবো,' বললেন আনন্দ রায়। 'উনি ঠিকই বলেছেন, উর্মিলা। তুমি সঙ্গে গেলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হবে বেশি। উনি যা বলছেন শোনো।'

নীরবতা নেমে এলো কামরায়। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো উর্মিলা।

'ঠিক আছে,' চোখ মুছতে মুছতে বললো ও। 'আমি থাকবো এখানে···ভেবেছিলাম বাবার দেহাবশেষটা একবার দেখবো। কিন্তু তোমার যদি এতই অসুবিধা হয়—।'

ঠোঁট কামড়ালো কুয়াশা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো দেখেনি

ও ব্যাপারটাকে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ও। অবশেষে বললো, 'ঠিক আছে উর্মিলা, আর বাধা দেবো না আমি।'

আনন্দে চক চক করে উঠলো উর্মিলার দুচোখ।

'সত্যিই আমাকে নিয়ে যাবে তুমি?'

'হ্যাঁ। আগেই ভাবা উচিত ছিলো আমার, এতদূর এসে বাবার সমাধিস্থানটা অন্তত না দেখে ফিরে যাবে কেন?' আনন্দ রায়ের দিকে ফিরলো কুয়াশা। 'এক্ষুণি রওনা হওয়া দরকার আমাদের। দয়া করে বলবেন, রাজেন্দ্র সিং-এর সমাধিমন্দিরটা কোথায়?'

'ওহ্, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, মিস্টার কুয়াশা। সহজ রাস্তা, মনে রাখতে পারবেন না লিখে নেবেন?'

'বলুন, মনে থাকবে আমার।'

'বেশ, তাহলে, মঠ থেকে বেরিয়ে পুরনো শহরের ধ্বংসস্তূপের দিকে গেছে যে রাস্তা সেটায় উঠবেন। সোজা এগিয়ে যাবেন। শহরের প্রবেশ মুখে দেখবেন খাড়া এক সারি সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবেন ওপরে। তারপর শিবমন্দিরের দিকে যে রাস্তাটা গেছে সেটা ধরে এগোবেন—দেখলেই চিনতে পারবেন মন্দিরটা, ওখানে মন্দির একটাই। এখন বোধহয় ঝোপ ঝাড়ে ছেয়ে গেছে পথ, তবু, আমার ধারণা, এগোতে খুব একটা কষ্ট হবে না আপনাদের। কিছু দূর যাওয়ার পর ফাঁকা একটা চত্বরে পৌঁছুবেন, সেটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সুন্দর বাঁধানো পুকুর আছে।'

ইতস্তত করছে বৃদ্ধ। তার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো কুয়াশা।

'হ্যাঁ, বলুন,' বললো ও। 'পুকুরের কাছে পৌঁছুনোর পর কি

করতে হবে ?'

'পুকুরের দুপাশে দুটো মূর্তি আছে, দেখবেন। একটা কার্তিকের, একটা গণেশের। গণেশের মূর্তিটা আসলে একটা ফোয়ারা। পানির ধারা ছুটছে ওটার শুঁড় দিয়ে। গণেশের মূর্তিটার গোড়ায় বাঁ দিকে একটা আলগা পাথর আছে। ঐ পাথরটার নিচে আছে একটা ব্রোঞ্জের হাতল মতো। ঐ হাতলটা ঘোরালে মূর্তির শুঁড় দিয়ে পানি বেরোনো বন্ধ হয়ে যায়, তখন প্রচণ্ড চাপ পড়ে ফোয়ারার নলে। পুকুরের উল্টো দিকে কার্তিকের মূর্তি। ফোয়ারার নলের সাথে যোগাযোগ আছে ওটার। গণেশের শুঁড় দিয়ে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেলে নলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাতে গোড়ার কাছ থেকে সরে যায় কার্তিকের মূর্তিটা। ওটার কাছে গিয়ে দেখবেন মূর্তিটা সরে যাওয়ায় কুয়ার মতো একটা পথ তৈরি হয়েছে, সিঁড়ি নেমে গেছে কুয়ার ভেতর। একটা সুড়ঙ্গে গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় রাজেন্দ্র সিং-এর সমাধিমন্দির।'

'আচ্ছা, ওখানে ঢোকার বা বেরোনোর পথ কি ঐ একটাই, না আরো আছে ?' জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'কিংবদন্তী আছে, আরো একটা পথ আছে ওখানে ঢোকার। কিন্তু কোথায় তা কেউ জানে না। অনেক আগে, বাদশা আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছেন, তখন তৈরি করা হয়েছিলো ঐ পথটা। তৈরির পরদিনই উধাও হয়ে গিয়েছিলো কারিগররা। কেউ আর কোনোদিন তাদের খোঁজ পায়নি। পথটার কথাও কেউ জানতে পারেনি কোনোদিন।'

'তাহলে রওনা হওয়া যাক।' উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। 'তুমি সঙ্গে থাকায় সুবিধাই হবে, ঊর্মিলা, সহজে খুঁজে বের করতে

পারবো তোমার বাবার দেহটা।'

অবাক চোখে তাকালো ঊর্মিলা কুয়াশার দিকে।

'এক্ষুণি!? এই রাত দুপুরে যাওয়া কি ঠিক হবে, কুয়াশা? সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হতো না?'

'উঁহুঁ, ঊর্মিলা, লিন অস্থির হয়ে ওঠার আগেই যাওয়া উচিত, নইলে কখন কি করে বসে ক্রিমিন্যালটা ঠিক নেই।'

'জো হুকুম, জাঁহাপনা!'

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে আনন্দ রায়ের দিকে তাকালো কুয়াশা।

'আমি একটু বাথরুমে যাবো, স্বামীজি,' বিব্রত হওয়ার ভঙ্গি করলো ও।

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। দরজার কাছে গিয়ে উঁচু স্বরে ডাকলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে। 'ওঁকে শৌচাগারে পৌঁছে দাও তো।'

প্রদীপ হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো তরুণ সন্ন্যাসী। একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে ইশারা করলো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে। এটাই শৌচাগার।

'প্রদীপ লাগবে?' জিজ্ঞেস করলো সন্ন্যাসী।

'না। টর্চ আছে আমার কাছে। আপনার দাঁড়িয়ে থাকারও কোনো দরকার নেই, আমি নিজেই চলে যেতে পারবো স্বামীজির কামরায়।'

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো কুয়াশা।

দু'মিনিট পর আনন্দ রায়ের ঘরে ফিরে এলো ও। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝোঁকালো।

'আসি তাহলে, স্বামীজি। আবার দেখা হবে কি না বলতে

পারছি না। আপনার সহযোগিতার কথা মনে থাকবে চিরদিন।'

ঘুরে দাঁড়ালো কুয়াশা। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো করিডোরে। পেছন পেছন উর্মিলা। করিডোর পেরিয়ে সেই আলো-আঁধারি কামরায়। তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখলো সেখানে, এক কোণে একটা বিছানায় শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'আমরা এখন বেরোবো,' বললো কুয়াশা।

উঠে এলো তরুণ সন্ন্যাসী। আগের মতোই প্রদীপ হাতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেল ওদের। মঠের বাইরে বেরিয়ে এলো কুয়াশা আর উর্মিলা।

দশ

'আমরা কি গাড়িতেই যাবো, না হেঁটে?' জিজ্ঞেস করলো উর্মিলা।

'অবশ্যই গাড়িতে। গাড়ি থাকলে আবার হাঁটে কে? যে পর্যন্ত গাড়িতে যাওয়া যায় যাবো। তারপর দরকার হলে হাঁটা যাবে।'

মঠের সদর ফটক থেকে গজ বিশেক দূরে দাঁড় করিয়েছিলো কুয়াশা কুমার সিং-এর কনভর্টিবলটা। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল ওরা ওটার কাছে। প্রায় একই সাথে দুজন দুদিক থেকে খুললো দুটো

দরজা। ঠিক সেই সময় ডাকাতদের তীব্র চিৎকারে মুখর হয়ে উঠলো নিস্তব্ধ রাতের আকাশ।

'মা গো!' আঁতকে উঠলো উর্মিলা।

প্রথম চিৎকারটা হলো কাছেই কোথাও। পরেরটা একটু দূরে, তার পরেরটা আরো দূরে। সংবাদ চলে গেল লিন এর কাছে, ওরা রওনা হয়েছে আবার। নিশ্চয়ই দু'একজন ডাকাত এবার আসবে পেছন পেছন, ভাবলো কুয়াশা। কিন্তু গাড়ির সাথে পাল্লা দেবে কি করে? দৌড়াবে না রণপা ব্যবহার করবে? বেশি না, পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও ঠ্যাঙাড়ে ঠগীরা এক রাতের পথ এক দেড় ঘণ্টায় পার হয়ে যেতো রণপা ব্যবহার করে। এখনো কি ওরা তেমন পারদর্শী ও জিনিস ব্যবহারে? যতটুক জানে কুয়াশা, ছুরি আর ঠ্যাঙা চালানোয় ওস্তাদ ঠগীরা। তবে খুব একটা শঙ্কিত হলো না ও। আপাতত দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। প্রথমত ওরা থাকছে গাড়ির ভেতর, দ্বিতীয়ত যতক্ষণ না গুপ্তধনের কাছে পৌঁছুচ্ছে ততক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বেশ ভালো কৌশল করেছে লিন। উর্মিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার ঝামেলা পোহায়নি। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে বাধ্য হয়েই ও দেখিয়ে দেবে কোথায় আছে গুপ্তধন।

দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো কুয়াশা। কাউকে দেখতে পেলো না। গাড়িতে উঠে বসলো ও। উর্মিলা-ও উঠলো।

ইগনিশনে চাবি ঢোকালো কুয়াশা। স্টার্ট দিলো ইঞ্জিন। গিয়ার বদলে ক্লাচ ছাড়লো। এক সেকেণ্ড পর চলতে শুরু করলো গাড়ি। দু'মিনিট লাগলো এবড়োখেবড়ো সাইডরোড ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠতে। তারপর মোড় নিয়ে সোজা পুরনো শহরের দিকে।

মনে মনে একটা প্ল্যান খাড়া করার চেষ্টা করছে কুয়াশা। কিন্তু দু'সেকেণ্ড ভাবতেই বুঝে ফেললো, সম্ভব নয় তা। লিন কিভাবে, কখন, কোন দিক থেকে হাজির হবে কিছুই জানা নেই, এই পরিস্থিতিতে কোনো পরিকল্পনাই করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে আপাতত মাথাটাকে ফাঁকা রাখাই ভালো। লিন-এর মুখোমুখি যখন হবে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। কোমরে গোঁজা কুমার সিং-এর অটোমেটিকটার অস্তিত্ব একবার অনুভব করে নিলো ও। রাস্তার মাঝখানে বড় একটা গর্তের পাশ কাটিয়ে পেছন ফিরে তাকালো। ফাঁকা পড়ে আছে অমসৃণ পাথুরে পথ, ডাকাতদের কোনো চিহ্ন নেই।

এমন সময় আবার শোনা গেল চিৎকার। রাস্তার একেবারে পাশ থেকে। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো কুয়াশা। কোমরে শাদা কাপড় জড়ানো এক ঠ্যাঙাড়েকে দেখতে পেলো—কোনো লুকোচুরির বালাই নেই, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝোপের সামনে, হাতে একটা ভোজালি, চকচক করছে চাঁদের আলোয়। এক সেকেণ্ড পরেই দূর থেকে সাড়া দিলো একজন। পরের চিৎকারটা আর শুনতে পেলো না ওরা, চাপা পড়ে গেল গাড়ির শব্দের তলে।

সাইড রোডটা যেখানে মেইন রোডের সাথে মিশেছে সেখান থেকে খুব বেশি হলে দু'মাইল পুরনো শহরের দূরত্ব। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সাত আট মিনিটের ভেতর পৌঁছে গেল ওরা শহরের প্রবেশ মুখে। বিশাল এক সার সিঁড়ি খাড়া উঠে গেছে ওপর দিকে। সিঁড়ির একেবারে গোড়ায় নিয়ে গাড়ি থামালো কুয়াশা। স্টার্ট বন্ধ করে চাবিটা খুলে নিলো ইগনিশন থেকে।

'এবার আর হাঁটা ছাড়া উপায় নেই,' উর্মিলার দিকে ফিরে বললো ও। তারপর নেমে এলো গাড়ি থেকে। নেমে এলো উর্মিলাও।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো ওরা। একটু অবাক না হয়ে পারলো না কুয়াশা, পুরো শহরটা এত উঁচুতে তৈরি করার কারণ কি হতে পারে? শহরের নিচে কি আরেকটা গুপ্ত শহর রয়েছে? প্রাচীন কালের রাজা বাদশাদের কীর্তি, কে বলতে পারে?

সিঁড়ির একদম ওপরে বিরাট একটা তোরণ। কালের অবক্ষয়ে খসে খসে পড়ছে, তবু দেখে বোঝা যায়, এককালে অত্যন্ত সুদৃশ্য ছিলো ওটা। তোরণের দু'পাশে বিরাট দুটো বাঘের মূর্তি। আসল বাঘের অন্তত পাঁচগুণ হবে একেকটার আয়তন। কিছুদূর ওঠার পর ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে লাগলো প্রাচীন নগরীর অট্টালিকাগুলো। প্রথমে চূড়া অথবা ছাদ, তারপর যত উঠতে লাগলো ওরা ততই দেখা যেতে লাগলো অন্যান্য অংশ—তিনতলা, দোতলা, একতলা।

সিঁড়ির ওপরে উঠে এলো ওরা। আলতো করে একটা বাঘের মূর্তির ওপর হাত ছোঁয়ালো কুয়াশা। পুরু ধুলোর স্তর জমে আছে। সামনে চোখ ফেরাতেই দূরে দেখতে পেলো একটা মন্দির। অনেক উঁচুতে উঠে গেছে সেটার চূড়া। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় প্রথমে এই চূড়াটাই নজরে পড়েছিলো ওদের। এত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে পাথরের গায়ে কারুকার্যগুলো।

'চলো এগোনো যাক.' উর্মিলার দিকে তাকিয়ে বললো কুয়াশা।

'হ্যাঁ চলো।'

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শুরু হয়েছে রাজপথ।

বেশ প্রশস্ত। আগে বোধহয় ইট বিছানো ছিলো, এখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে হবে ইটের অস্তিত্ব। প্রচুর ইট মানুষে খুলে নিয়ে গেছে, কিছু চাপা পড়ে গেছে শতাব্দী ধরে গজানো ঘাস আর ঝোপ ঝাড়ের নিচে। ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে লাগলো ওরা।

কিছু দূর এগোতেই কুয়াশা খেয়াল করলো, পথটা মন্দিরের দিকে যায়নি। নগর তোরণের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিলো, সোজা এগিয়ে গেলেই মন্দির। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পথটা ক্রমশ বেঁকে গেছে। ওরা যত এগোচ্ছে মন্দিরটা ধীরে ধীরে ততই ডানে চলে আসছে। তারমানে মন্দিরের দিকে যেতে হলে এই রাস্তা থেকে বেরিয়ে ডান দিকে গেছে এমন একটা রাস্তায় উঠতে হবে।

তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখতে রাখতে এগিয়ে চলেছে কুয়াশা। ওর গায়ের সাথে প্রায় সেঁটে থেকে হাঁটছে ঊর্মিলা। দু'পাশে এখনো বিশেষ দালানকোঠা শুরু হয়নি। দু'একটা যা আছে বেশ দূরে দূরে। দেখলেই বোঝা যায় পরিত্যক্ত ওগুলো। ঝোপ ঝাড়ে ছেয়ে আছে আঙিনা।

আরো কিছু দূর এগোনোর পর শুরু হলো মূল শহর। গায়ে গায়ে লাগানো দোতলা-তিনতলা বাড়ি। একতলাও আছে দু'-একটা। দোতলাই সবচেয়ে বেশি। বেশির ভাগ বাড়িই ইটের তৈরি। আস্তর খসে গেছে অনেক আগে, দেয়ালগুলো এখন দাঁত বের করা মড়ার খুলির চেহারা নিয়েছে। পাথরের তৈরি বাড়িও দু'একটা আছে, সেগুলোর অবস্থা একটু ভালো। তবে জানালা-দরজাগুলো অদৃশ্য হয়েছে রোদ জলে। এতবড় একটা শহরে

দালানকোঠা আছে অথচ মানুষ নেই, ভাবতেই গা ছম ছম করে ওঠে। শহরটা পরিত্যক্ত হলো কেন ভেবে পেলো না কুয়াশা।

দালানের সারির মাঝখান দিয়ে শ'দুয়েক গজ যাওয়ার পর ডান দিকে যাওয়ার রাস্তাটা পেলো ওরা। মূল রাস্তার সঙ্গে মোটামুটি সত্তর ডিগ্রি কোণ তৈরি করে এগিয়ে গেছে। রাস্তার শেষ মাথায় দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা।

মোড় নিয়ে এগোলো ওরা। এ রাস্তার দু'পাশেও গায়ে গায়ে লাগানো উঁচু দালান। আগেরগুলোর মতোই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা।

মোড় নেয়ার পাঁচ মিনিট পর হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল দালান কোঠার সারি। বড় একটা পাথর বাঁধানো চত্বরে এসে পড়েছে ওরা। আনন্দ রায় যেমন বলেছিলো ঠিক তেমন, মাঝখানে ছোট একটা পুকুর। গোল। পাথর দিয়ে বাঁধানো। দু'পাশে দুটো মূর্তি। এপাশে গণেশ ওপাশে কার্তিক। কার্তিকের চেহারাটা এত দূর থেকে ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না, তবে হাতির মতো মাথা দেখে গণেশকে চিনতে অসুবিধা হলো না। ঝরনার মতো অবিশ্রাম ধারায় পানি ছুটছে গণেশের শুঁড় দিয়ে। কার্তিকের মূর্তিটার ওপাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা তারপর মন্দিরের প্রশস্ত উঠান। উঠানের চারপাশে চমৎকার একটা বাগান। অগুনতি ফুল ফুটে আছে বাগানের গাছগুলোয়। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ফুলের রং ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না।

মন্দিরটাই এই প্রাচীন শহরের একমাত্র দালান যেটা এখনো সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। প্রধান কারণ সম্ভবত, মন্দিরটা এখনো ব্যবহার হয় প্রার্থনার কাজে। বছরে একবার তীর্থযাত্রীরা আসে নটরাজ শিবের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করতে। সে সময় জাঁক-

জমকপূর্ণ এক মেলা বসে সামনের চত্বরে। অন্তত কিছু দিনের জন্যে হলেও সরগরম হয়ে ওঠে মৃত শহরটা। কানওয়ার মঠের পুরোহিতরা মাঝে মাঝে এসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখে যায় মন্দিরটাকে। সে সময় বাগানটারও পরিচর্যা করে ওরা। সম্ভবত ওরাই চালু রেখেছে সামনের ফোয়ারাটা।

পুকুরের দিকে এগোতে যাবে কুয়াশা, এমন সময় কি মনে করে পেছন ফিরে চাইলো ও। কালো কালো দু'তিনটে মূর্তি দেখতে পেলো, মোড় পেরিয়ে বেশ কিছুদূর এসে পড়েছে। ওকে পেছন ফিরতে দেখেই লাফিয়ে একটা ভাঙা বাড়ির দিকে ছুটলো ওরা।

'আরে আরে, পালাচ্ছো কেন,' একটু হেসে হিন্দীতে চিৎকার করলো কুয়াশা। 'চলে এসো, আমরা তোমাদের মারবো না!'

থামলো না ডাকাতগুলো, মুহূর্তের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ভাঙা বাড়ির ভেতর।

'কারা?' কুয়াশার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এলো উর্মিলা।

'কারা আবার? বন্ধুরা—যারা তোমার কাকার হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের।' একটু চুপ করে রইলো কুয়াশা, তারপর বললো, 'কিন্তু এখনো ওরা লুকোচুরি খেলছে কেন? আমরা জানি ওরা আমাদের পেছন পেছন আসছে; আর ওরাও জানে, আমরা জানি ওরা আমাদের পেছন পেছন আসছে। তাহলে? কেন এক-জোট হয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে না?' শেষ দিকে এসে একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো ওর গলা।

'তা আমি কি করে জানবো?' বললো উর্মিলা। 'হয়তো লিন এ রকমই নির্দেশ দিয়েছে ওদের!'

'তা হতে পারে।' উর্মিলার হাত ধরলো কুয়াশা। তারপর

এগোলো পুকুরের দিকে।

পুকুরের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। উর্মিলার হাত ছেড়ে দিয়ে গণেশের মূর্তিটা ভালো করে দেখতে লাগলো কুয়াশা। পাড়ের খানিকটা অংশ একটু উঁচু হয়ে ঢুকে গেছে পুকুরের ভেতর দিকে, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। ওপাশে কার্তিকের মূর্তিটাও একই রকম পুকুরের ভেতর ঢুকে আসা একটা অংশের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তি দুটোর ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, গোল পুকুরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে খেলা করছে দু'জন।

পেছন ফিরে তাকালো কুয়াশা, ঠগী ডাকাতগুলোকে দেখা যায় কি না। কিন্তু না, একজনেরও চেহারা নজরে পড়লো না।

'তুমি এখানে দাঁড়াও,' উর্মিলার দিকে তাকিয়ে বললো কুয়াশা। তারপর ডিঙি পেড়ে উঠে পড়লো পুকুরের ভেতর ঢুকে যাওয়া উঁচু পাথরটার ওপর। ঝুঁকে মূর্তির গোড়াটা পরীক্ষা করলো ও। চাঁদের আলো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, বিশেষ কিছু দেখতে পেলো না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো কুয়াশা। জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে শার্টের বুক পকেট থেকে বের করলো একটা পেন্সিল টর্চ—কুমার সিং-এর প্রাসাদে সার্চ করার পর টর্চটাও ফেরত দিয়েছিলো মোটু দারোগা।

টর্চ জ্বালতেই ও দেখতে পেলো আলগা পাথরটা। গোল। দুই ফুট মতো হবে ব্যাস। খাপে খাপে বসে আছে একটা গর্তের ভেতর। প্রথমে আঙুল দিয়ে চেষ্টা করলো ও পাথরটা উঠিয়ে আনার। কিন্তু পারলো না। বেশ ভারি, আর কিনারাটা মিশে আছে গর্তের কিনারের সাথে। আঙুলের যে সামান্য অংশ বাধলো ওটার কোণায় তাতে ওঠানো গেল না।

এবার ? পাথরটা না ওঠাতে পারলে কোনো লাভ হবে না। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এতক্ষণে নিশ্চয়ই লিন-এর কাছে খবর চলে গেছে, ওরা এখানে। তার মানে যে কোনো মূহূর্তে হাজির হবে সে। ডাকাতগুলোও এসে চড়াও হতে পারে। এখন উপায়? খালি হাতে পাথরটা ওঠানো যাবে না জানলে মঠ থেকেই ছুরি জাতীয় কিছু একটা নিয়ে আসতে পারতো।

হঠাৎ মনে পড়লো, চাবির রিংটা আছে পকেটে। ওর বড় স্যুট-কেসটার চাবি একটু লম্বাটে ধরনের এবং বেশ মজবুত। ওটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রিংটা বের করে চেষ্টা করলো ও। একবারেই সফল হলো। চাবিটার লেজ ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই সামান্য উঠে এলো পাথরটা। বাকিটুকু দু'হাতের দশ আঙুল দিয়েই সারতে পারলো।

পাথরটা উঠিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলো কুয়াশা। টর্চ জ্বালতেই গর্তের ভেতর দেখতে পেলো একটা ব্রোঞ্জের হাতল। ডান হাতে ধরলো ও হাতলটা। বেশ শক্ত। ঘোরানোর জন্যে শরীরের সবটুকু শক্তি এক জায়গায় করতে হলো। এক সেকেণ্ড পরেই দেখতে পেলো, গণেশের শুঁড় দিয়ে পানি বেরোনোর বেগ কমে গেছে। ধীরে ধীরে একদম বন্ধ হয়ে গেল পানি পড়া। ডুবন্ত মানুষের গলা দিয়ে যেমন হয় তেমন ঘড় ঘড়ে একটা আওয়াজ হচ্ছে শুধু। একটু পরে মিলিয়ে গেল শব্দটাও।

হাতল ছেড়ে দিয়ে ওপাশে কার্তিকের মূর্তিটার দিকে তাকালো কুয়াশা। প্রথমে কিছুই ঘটলো না। যেমন ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের কার্তিক। তারপরেই শোনা গেল যাঁতা ঘোরানোর

মতো ঘট-ঘট, ঘ্যাষ-ঘ্যাষ আওয়াজ। কার্তিকের মূর্তিটা ভিত্তিসহ নেমে গেল খানিকটা, তারপর সরে যেতে লাগলো এক পাশে। ঠিক এমনটা না হলেও এ ধরনের কিছু-ই যে ঘটবে জানতো, তবু সত্যি সত্যিই যখন ঘটলো তখন অবাক না হয়ে পারলো না কুয়াশা। জিনিসটা আধুনিক যুগের হলে কথা ছিলো না, সেই প্রাচীন আমলে এমন একটা পদ্ধতি ওরা তৈরি করেছিলো কি করে?

লাফ দিয়ে নেমে এলো কুয়াশা উঁচু জায়গাটা থেকে। ঊর্মিলার হাত ধরে ছুটলো ওপাশের দিকে। ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো পেছন রাস্তার দিকে। না, কোনো চিহ্নই নেই ঠগীদের। দশ সেকেণ্ডের ভেতর ওরা পৌঁছে গেল কার্তিকের মূর্তির কাছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেলো কুয়ার মুখটা। গোল। তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট হবে ব্যাস। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

'ও মা, এর ভেতর নামতে হবে নাকি?' শিউরে ওঠা গলায় বললো ঊর্মিলা।

'সে রকমই তো বলেছেন আনন্দ রায়। কেন ভয় পাচ্ছো?'

'নাহ্। ভয় কি?' ঊর্মিলা বললো বটে, কিন্তু গলার কাঁপুনিটা ঠিকই টের পেলো কুয়াশা।

আর কিছু না বলে টর্চ জ্বাললো ও। কুয়ার ভেতর ফেললো আলো। প্রায় পঁচিশ ফুট গভীর। সরু একটা লোহার মই নেমে গেছে নিচ পর্যন্ত। কেমন যেন ভেজা ভেজা আর শ্যাওলা পড়া কুয়ার দেয়াল। দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকার ফলে ভেতরের বাতাস দূষিত হয়ে পড়েছে কিনা কে জানে? স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ উঠে আসছে।

যাহোক, আর দেরি করা যায় না, এবার নামতে হবে। চার

পাশে একবার চোখ বুলালো কুয়াশা। কাউকে দেখতে পেলো না। উর্মিলার দিকে ফিরলো ও।

'তুমি আগে নামবে। আমি ওপর থেকে টর্চ ধরবো।'

'আমার ভয় করছে কুয়াশা। চলো আমরা ফিরে যাই।'

'দূর, পাগলামি কোরো না তো, সময় বয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলে সব পণ্ড হবে।'

'তাহলে তুমি আগে।'

'ঠিক আছে, আগে পরে না, এক সাথেই নামবো আমরা। তুমি দুটো ধাপ নেমে আমাকে দাঁড়ানোর জায়গা করে দাও, তারপর এক সাথে নামবো দু'জন, কেমন? আমি টর্চ ধরছি।'

আর আপত্তি করলো না উর্মিলা। কুয়ার পাশে বসে পা নামিয়ে দিলো মই-এর ওপর। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এক এক করে দুটো ধাপ নেমে গেল ও। তারপর কুয়াশা নামিয়ে দিলো পা। এক হাতে টর্চ ধরেছে নিচের দিকে মুখ করে, অন্য হাতে মই-এর কিনার ধরে নেমে যাচ্ছে। সবেমাত্র কুয়ার কিনার ছেড়ে ওর মাথাটা নেমেছে, এমন সময় মনে হলো পদশব্দ শোনা গেল যেন চত্বরে। ঝট করে নামা থামিয়ে এক ধাপ উঠে এলো ও। মাথাটা বেরিয়ে এলো কিনার ছাড়িয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো চারপাশে, কিন্তু কিছু দেখতে পেলো না।

'কি হলো?' নিচ থেকে শঙ্কিত গলা শোনা গেল উর্মিলার।

'কিছু না, মনে হলো যেন পায়ের শব্দ শুনলাম, কিন্তু কাউকে দেখছি না।'

শেষবারের মতো টর্চের আলো ফেলে চারপাশটা একবার দেখলো ও। তারপর নামতে শুরু করলো আবার।

পাঁচ মিনিট মতো লাগলো কুয়ার নিচে পৌঁছুতে। স্বাভাবিক একটা মই বেয়ে মাত্র পঁচিশ ফুট নামতে এত সময় লাগার কথা না, তবু লাগলো ঊর্মিলার কারণে। ভয়ে কাঁপছে বেচারা। ওকে সাহস দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করলো না কুয়াশা। ঝটপট টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে ফেললো কুয়ার তলাটা। ওপরে যতটুকু নিচেও ঠিক ততটুকুই ব্যাস। প্রায় গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ও আর ঊর্মিলা। কুয়ার যে পাশে মই লাগানো তার বিপরীত দিকে ওর কাঁধ সমান উঁচু একটা সুড়ঙ্গের মুখ। খুব সরু, দুজন পাশাপাশি যাওয়া সম্ভব নয়।

'আমার পেছন পেছন এসো,' ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে বললো কুয়াশা। তারপর কুঁজো হয়ে ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে।

ভাগ্য ভালো ওদের সুড়ঙ্গের মেঝে সমতল; হাঁটতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। তাছাড়া কয়েক পা এগোনোর পর থেকেই একটু একটু করে উঁচু হতে শুরু করেছে ছাদ, পাশেও বড় হচ্ছে। পনেরো ফুট মতো ঢুকে এসেছে ওরা সুড়ঙ্গের ভেতর দিকে, এমন সময় শোনা গেল ডাকাতদের টেনে টেনে উচ্চারণ করা দীর্ঘ রক্তহিম করা চিৎকার। কুয়ার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো আওয়াজ। আতঙ্কিত একটা চিৎকার করে কুয়াশাকে জড়িয়ে ধরলো ঊর্মিলা।

ওর হাত ধরলো কুয়াশা। কোমল গলায় বললো, 'ভয় কি? আমি তো রয়েছি, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো!'

ঠ্যাঙাড়েগুলো কুয়ায় নেমে আসে কিনা দেখার জন্যে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো কুয়াশা। কিন্তু না, তেমন কোনো আওয়াজ শুনতে পেলো না ও। চিৎকারের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ কুয়ার দিকে আলো ফেলে দাঁড়িয়ে রইলো কুয়াশা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোলো টানেল ধরে। লিন না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত বোধহয় ওপরেই বসে থাকবে ওরা, ভাবলো ও। হয়তো এরকমই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে। তার মানে, লিন যতক্ষণ না এসে পৌঁছুচ্ছে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত উর্মিলা আর ও।

কিন্তু কতক্ষণ লাগবে লিন-এর এসে পৌঁছুতে? খুব বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। তার মানে খুব বেশি একটা সময় ওরা হাতে পাচ্ছে না। হাঁটার গতি একটু দ্রুত করলো ও।

আর কিছুদূর এগোনোর পর ডান দিকে মোড় নিলো সুড়ঙ্গ। উর্মিলার হাত ধরে মোড় নিলো কুয়াশাও। দশ গজ যাওয়ার পরই বিরাট একটা গোল কামরায় শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। অদ্ভুত আকৃতি কামরাটার। বিশাল একটা অর্ধগোলক যেন উল্টো করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কামরার মাঝখানে এক মানুষ সমান একটা সরু স্তম্ভ। তার মাথায় বহু মূল্য একটা পাথর বসানো। সবুজাভ এক ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা থেকে। সেই আলোয় অস্পষ্টভাবে আলোকিত হয়ে আছে কামরাটা। এটাই তাহলে রাজেন্দ্র সিং-এর সমাধিমন্দির। কিন্তু মৃতদেহটা কই?

কামরার দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর তিন ফুট বাই দুই ফুট আকারের চৌকো একেকটা গর্ত। একটা গর্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কুয়াশা বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। গোলকুণ্ডার সাবেক রাজাদের একেকজনকে একেকটা গর্তে মমি করে রাখা হয়েছে। গর্তের ভেতর দিকে পা বাইরের দিকে মাথা। গর্তের ভেতর টর্চ মেরে ও দেখলো রাজকীয় পোশাক আশাক সব পরানো রয়েছে মমির গায়ে। দেহগুলো অবিকৃতই রয়েছে, তবে ডিহাইড্রেশনের ফলে শুকিয়ে

গেছে একটু। মুখের চামড়া হাড়ের সাথে সেঁটে গেছে, চোখ ঢুকে গেছে গর্তে। ফলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা, অনেকটা চামড়া-মোড়া কঙ্কালের মতো। অর্ধগোলক আকৃতির ঘরটার তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ভালোই। তবু দেহগুলো পচে যায়নি কেন ঠিক বুঝতে পারলো না কুয়াশা। অনুমান করলো, মৃতদেহগুলো এখানে সংরক্ষণ করার আগে হয়তো পচনরোধী কোনো পদার্থে চুবিয়ে নেয়া হয়েছিলো।

স্থান কাল পাত্র ভুলে প্রাচীন ফালির এই আশ্চর্য সাফল্য লক্ষ্য করছিলো কুয়াশা। হঠাৎ সচেতন হলো ও, মনে পড়ে গেল, কেন এসেছে এখানে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, এখনো সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ঊর্মিলা।

'কই বাবার দেহ ?' কুয়াশাকে তাকাতে দেখেই জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা।

'আছে এখানেই কোথাও। দাঁড়াও দেখছি।'

প্রতিটা শবাধারের নিচে প্রাচীন দেবনাগরী হরফে লেখা ঐ শবাধারে শোয়ানো রাজার নাম; জন্ম, অভিষেক এবং মৃত্যুর তারিখ। দু'তিনটে গর্তের নিচে লেখা দেখেই ও বুঝতে পারলো জন্ম তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়েছে মৃত দেহগুলো। দ্রুত তারিখ এবং নামগুলো দেখে যেতে লাগলো ও। অবশেষে এমন একটা গর্তের সামনে এলো যেটায় একটা মৃতদেহ আছে কিন্তু কোনো নাম তারিখ লেখা নেই। সেটার পর আরো ছ'সাতটা গর্ত, সেগুলো সব খালি।

এটাই হবে, রাজেন্দ্র সিং-এর সমাধিগুহা, ভেবে ইশারায় ঊর্মিলাকে ডাকলো কুয়াশা। পা পা করে এগিয়ে গেল ঊর্মিলা।

'বাবার চেহারা মনে আছে তোমার ?' জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা।

'আবছা ভাবে।'

'দেখ তো চিনতে পারো কিনা ?' টর্চ জ্বেলে আলো ফেললো কুয়াশা মমিটার মুখে।

'ওহ্।' তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে মুখ ঢাকলো উর্মিলা।

তাড়াতাড়ি ওর কাঁধে হাত রেখে আস্তে দুটো চাপড় দিলো কুয়াশা।

'কি, উর্মিলা, এটা তোমার বাবার দেহ ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে ?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো উর্মিলা।

'ছি, অমন করে না, তুমি কি আশা করেছিলে এত বছর পরেও নিখুঁত অবিকৃত দেখবে মৃতদেহের মুখ ?'

'তা আশা করিনি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর চেহারা হবে তা-ও ভাবতে পারিনি।' এখনো ফোঁপাচ্ছে উর্মিলা।

'এবার তুমি সুড়ঙ্গের মুখে চলে যাও, আমি দেখছি, লকেটটা পাওয়া যায় কি না।'

'না, আমি তোমার কাছ থেকে নড়তে পারবো না! আমার ভয় করছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়াও, কিন্তু এদিকে তাকিও না।'

ঘুরে আবার আলো ফেললো কুয়াশা রাজেন্দ্র সিং-এর মমিতে। একটু ঝুঁকে তাকালো বুকের দিকে। সোনার চেনের সাথে লাগানো লকেটটা দেখতে পেলো। পড়ে আছে এক পাশে। টর্চটা বাঁ হাতে নিয়ে সাবধানে খুলে আনলো ওটা কুয়াশা। তারপর উর্মিলাকে ধরে নিয়ে এলো মাঝখানের স্তম্ভটার কাছে।

নিচের দিকে সামান্য উঁচু হয়ে থাকা একটা অংশে চাপ দিতেই খুলে গেল লকেটের ঢাকনা। শক্ত করে পাকানো একটা পার্চমেন্ট বেরোলো। পাক খুলতেই দেখা গেল, ওটা লম্বায় তিন ইঞ্চি চওড়ায় দুই ইঞ্চি। ওপরে খুদে খুদে অথচ স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা কয়েকটা কথা। ইংরেজীতে। পড়লো কুয়াশা :

'আমি যেখানে শুয়ে আছি এর ঠিক উল্টো দিকে রাজা সুরেন্দ্র সিং-এর শবসংরক্ষণ গুহা। ওটার ভেতরে ডান পাশে একটা আংটা আছে। গোলকুণ্ডার ধনরত্ন যে কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাতে ঢুকতে হলে ঐ আংটায় টান দিতে হবে। দেবতারা তোমাদের মঙ্গল করুন।'

পার্চমেন্টটা ঝটপট আগের মতো পাকিয়ে লকেটের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললো কুয়াশা। তারপর রেখে দিলো জ্যাকেটের পকেটে। উর্মিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে এগিয়ে গেল রাজেন্দ্র সিং-এর দেহ যেখানে রয়েছে তার উল্টো দিকের গর্তটার দিকে। 'শবসংরক্ষণ গুহা।' নামটা ভালোই দিয়েছে রাজেন্দ্র সিং, মনে মনে বললো কুয়াশা।

প্রথমবারেই ও পৌঁছুলো গর্তটার সামনে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নিচে লেখা নামটা পড়লো। হ্যাঁ, ঠিকই আছে, রাজা সুরেন্দ্র সিং।

'দুঃখিত, রাজা সুরেন্দ্র সিং, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে।'

সাবধানে হাত ঢুকিয়ে দিলো কুয়াশা সুরেন্দ্র সিং-এর ডান পাশ দিয়ে। একটু হাতড়াতেই স্পর্শ পেলো আংটার। শক্ত করে ধরলো ও আংটাটা। টানলো ওপর দিকে। কিছুই ঘটলো না, যেমন

ছিলো তেমন রইলো আংটা এবং শবাধার। কেমন একটু বিভ্রান্ত অনুভূতি হচ্ছে কুয়াশার। ঘোরানোর চেষ্টা করলো আংটাটা। কিছুই ঘটলো না এবারও। এমন সময় অস্পষ্ট একটা কোলাহল শোনা গেল, সুড়ঙ্গের দিক থেকে। ঊর্মিলা ছুটে এলো কুয়াশার পাশে। চকিতে একবার সুড়ঙ্গের মুখের দিকে তাকালো কুয়াশা। ক্রমশ এগিয়ে আসছে শব্দ। সম্ভবত দলবল নিয়ে কুয়ার ভেতর নেমে পড়েছে লিন! সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে আসছে এখন।

অস্থির হয়ে উঠলো কুয়াশা। ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে হ্যাঁচকা একটা টান দিলো আংটায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক একটা টান অনুভব করলো হাতে। হাতের সাথে সাথে ওর শরীরটাও একটু এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। সময় মতো আংটা ছেড়ে দেয়ায় মাথাটা বাড়ি খেলো না দেয়ালের সাথে। হাত বের করে এনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। রাজা সুরেন্দ্র সিং-এর মমিসহ অদৃশ্য হয়েছে মাটি থেকে দু'ফুট উঁচু শবাধারটা। তিন ফুট চওড়া পাঁচফুট উঁচু একটা গহ্বর তৈরি হয়েছে দেয়ালের গায়ে। টর্চ জ্বেলে দেখলো কুয়াশা, প্রায় দশ ফুট পুরু দেয়ালের ওপাশে আরেকটা কুঠুরি। ওখানেই তাহলে আছে গোলকুণ্ডার ধনরত্ন!

অনেক কাছে এসে পড়েছে কোলাহল। মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গের মোড়টার ওপাশেই। ঊর্মিলার দিকে ফিরলো কুয়াশা।

'তাড়াতাড়ি! ঢুকে পড়ো ভেতরে!' ফিস ফিস করে বললো ও। 'তোমার পেছনেই থাকছি আমি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করলো ঊর্মিলা। কুয়াশা খেয়াল করলো, থর থর করে কাঁপছে বেচারা। সম্ভবত ভাবছে এবার আর রক্ষা নেই।

উর্মিলার পেছন পেছন কুয়াশাও কুঁজো হয়ে ঢুকে পড়লো গুপ্ত সুড়ঙ্গটায়। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর পৌঁছে গেল ওপাশে। ছোট্ট একটা কুঠুরিতে এসে পড়েছে ওরা।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরোনো মাত্র চোখ ধাঁধিয়ে গেল কুয়াশার। শাদা মর্মর পাথরে তৈরি কুঠুরিটা। গোল সমাধিমন্দিরের মতো এখানেও মাঝখানে একটা দণ্ডের ওপর আলো বিকীরণকারী পাথর বসানো। সবুজাভ আলোয় ভরে আছে ঘর। মেঝেতে রক্তের মতো লাল পুরু গালিচা পাতা। গালিচার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য মণি-মানিক্য, হীরা-জহরৎ। এক পাশে উল্টে পড়ে আছে বড় বড় কয়েকটা মাটির পাত্র। সেগুলোর ভেতর থেকেও বেরিয়ে এসেছে অনেক বহুমূল্য পাথর—চুনী, পান্না, মুক্তা, নীলকান্ত, পোখরাজ।

সুড়ঙ্গের মুখ যেদিকে তার উল্টো দিকে একটা কাঠের দরজা। ওপাশে কি আছে জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে কুয়াশার, কিন্তু আপাতত তা সম্ভব নয়। অনেক বেড়ে গেছে হৈ-চৈ-এর আওয়াজ। বোধহয় গোল সমাধি মন্দিরে পৌঁছে গেছে লিন আর তার দলবল। এক্ষুণি কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে, না হলে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এপাশে চলে আসবে ওরা। ঘুরে দাঁড়ালো ও। সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলো ওপাশের সমাধিমন্দিরে আলোর রং বদলে গেছে। অস্পষ্ট সবুজ আলোর বদলে এখন দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল কমলা আলো। লিন-এর ঠ্যাঙাড়েরা মশাল নিয়ে এসেছে সম্ভবত!

দ্রুত চিন্তা চলছে কুয়াশার মাথায়। নিঃসন্দেহে গুপ্ত পথটা বন্ধ করার কোনো উপায় এপাশ দিয়েও আছে, কিন্তু কি সেটা। তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের দেয়াল দুটো হাতড়ে দেখলো ও। এবার বাম পাশে

পেলো একটা আংটা। টান দিলো। কিছুই ঘটলো না। ইতি-মধ্যে দু'তিন জন লোক ঢুকে পড়েছে সুড়ঙ্গে। একজনের হাতে মশাল। মাথা নিচু করে এগিয়ে আসছে তারা।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কুয়াশার। লোকগুলোর ভেতর একজন শ্বেতাঙ্গ দেখতে পেলো ও। জুয়াড়ী ফ্যারেলের সঙ্গী হ্যাগার্ডকে চিনতে অসুবিধা হলো না। সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি জায়গায় এসে গেছে ওরা। মাথা নিচু করে এগোতে হচ্ছে বলে সময় লাগছে বেশি, নয় তো এতক্ষণ চলে আসতো এপাশে!

আংটা নিয়ে কসরত করে চলেছে কুয়াশা। সব ভাবে চেষ্টা করা হয়ে গেছে, কোনো লাভ হয়নি। বাকি আছে শুধু ঠেলা দেয়া। গায়ের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় করে ঠেলা দিলো ও আংটায়। ঘটাং করে একটা শব্দ হলো। হ্যাগার্ড আর তিন ডাকা-তের পেছনে বন্ধ হয়ে গেলো সুড়ঙ্গের মুখ। সুড়ঙ্গের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো চারজন। ভয় ফুটে উঠতে দেখলো কুয়াশা হ্যাগা-র্ডের চোখে। ঝট করে কোমরের কাছ থেকে পিস্তল বের করলো সে। একই সঙ্গে ভোজালি হাতে নিয়েছে তিন ডাকাত। এক সেকেণ্ড পর এগিয়ে আসতে লাগলো পা পা করে।

এগারো

অর্ধগোলকাকৃতির সমাধিমন্দিরটা গিজ গিজ করছে ঠগী ডাকাতে। চার পাঁচটা মশাল জ্বলছে। উজ্জ্বল কমলা আলোয় ভরে গেছে কামরা। রাজা সুরেন্দ্র সিং-এর শবসংরক্ষণ গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লিন। পাশে ফ্যারেল। কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছে জুয়াড়ীটার চেহারা। এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিলো সুড়ঙ্গের মুখ সেখানে এখন একটা দেয়াল। দেয়ালের গায়ে একটা গর্ত, তাতে শোয়ানো শুকিয়ে যাওয়া একটা মৃতদেহ।

'নিশ্চয়ই এপাশ থেকে খোলা যায় গুপ্ত পথটা,' গম গম করে উঠলো লিনের গলা। 'খোঁজ করে দেখ, মিস্টার ফ্যারেল।'

খুঁজতে শুরু করলো ফ্যারেল। সর্দার ধরনের দু'তিনজন ঠগীকেও লাগিয়ে দিলো। বৃত্তাকৃতির কামরাটার দেয়াল তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলো তারা।

এক এক করে পাঁচটা মিনিট পেরিয়ে গেল। ওপরে শান্ত নির্বিকার দেখালেও ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে লিন—এখনো গুপ্ত দরজা খোলার কোনো পথ খুঁজে পায়নি ফ্যারেল বা তার

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে সরে এলো কুয়াশা। এক লাফে উর্মিলার কাছে পৌঁছুলো। উর্মিলা তখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে লাল গালিচার ওপর পড়ে থাকা অজস্র মূল্যবান রত্নের দিকে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেছে। ঝটকা মেরে ওকে ধরে দেয়ালের কোণায় টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো কুয়াশা। ইতিমধ্যে কুমার সিং-এর পিস্তলটা চলে এসেছে ওর হাতে।

এক লাফে আবার সুড়ঙ্গের মুখে চলে এলো কুয়াশা। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিলো সুড়ঙ্গে। এসে গেছে হ্যাগার্ড আর তিন ডাকাত। পিস্তল উঠিয়ে তৈরি হলো ও।

হ্যাগার্ড জানে, কুয়াশার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে আসছে সে। হাতে পিস্তল থাকায় আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বেড়ে গেছে তার। সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছে গেছে সে। আর দুপা এগোলেই ছোট্ট কুঠুরি। এমন সময় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। পেছন থেকে মশালের আলো গিয়ে পড়েছে গোলকুণ্ডার রত্নরাজির ওপর। সব ভুলে ছুটলো সে। এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিলো কুয়াশা। পিস্তল তোলাই ছিলো, সর্বশক্তিতে মাজলটা নামিয়ে আনলো লোকটার মাথায়। চিৎকার করার-ও সুযোগ পেলো না হ্যাগার্ড। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পাথরের মেঝেতে।

হ্যাগার্ডের পেছনেই মশালধারী ডাকাত। সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সে-ও দেখেছে রত্নসম্ভার। হ্যাগার্ডের পেছন পেছন ছুটলো সে-ও। এমন সময় আচমকা মুখ থুবড়ে পড়লো হ্যাগার্ড, তাল সামলাতে পারলো না ডাকাতটা। হ্যাগার্ডের জ্ঞানহীন দেহে

পা বেধে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। হাতের খোলা ভোজালিটা ঢুকে গেল হ্যাগার্ডের কোমরে। একই ভঙ্গিতে পিস্তলের নল নামিয়ে আনলো কুয়াশা। মশালধারীও নিঃশব্দে জ্ঞান হারালো। হাত থেকে খসে পড়েছে মশাল। একটুর জন্যে গালিচার ওপর পড়েনি। তাড়াতাড়ি পা দিয়ে মশালটা একটু দেয়ালের দিকে ঠেলে দিলো কুয়াশা। নয়তো আগুন ধরে যেতে পারে গালিচায়।

ইতিমধ্যে অন্য দুই ঠগী বেরিয়ে এসেছে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে। একই সঙ্গে অজস্র ধন রত্ন আর সঙ্গীদের জ্ঞানহীন-প্রাণহীন দেহ দেখে পুরো-দস্তুর বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তারা। এই সুযোগটা কাজে লাগালো কুয়াশা। ওর আর ডাকাত দু'জনের মাঝে দূরত্ব হবে দু' কি তিন পা। পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে এক লাফে জায়গাটুকু পেরোলো ও। তারপর একই সঙ্গে দু'জনের চোয়ালে প্রচণ্ড দুটো ঘুসি। ছিটকে তিন হাত দূরে গিয়ে পড়লো দুই ডাকাত। ঘুসি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তি দূর হয়ে গেছে ওদের। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ভোজালি বাগিয়ে ধরতে গেল দুজন। কিন্তু তার আগেই ওদের কাছে পৌঁছে গেছে কুয়াশা। কাছের জনকে বেছে নিয়ে কষে এক লাথি চালালো তার কানের ঠিক ওপরে। বিনা বাক্যব্যয়ে ভোজালি ছেড়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়লো লোকটা।

ইতিমধ্যে ভোজালি হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে অন্যজন। সাঁ করে ভোজালি চালালো সে কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে। ঝট করে মাথা নামিয়ে নিয়েই ডাইভ দিলো কুয়াশা। প্রচণ্ড বেগে মাথাটা গিয়ে লাগলো ডাকাতটার সোলার প্লেক্সাসে, সেই সাথে তল পেটের খানিকটা নিচে প্রচণ্ড এক ঘুসি। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল লোকটা। দাঁড়ানো অবস্থায়ই টললো দু'সেকেণ্ড। হাত থেকে খসে পড়ে গেল

ভোজালিটা। এর পর কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়লো মেঝেতে।

এবার একনম্বর কাজ ঃ মশালটা নেভাতে হবে। এমন বদ্ধ কুঠুরিতে অতবড় একটা মশাল জ্বললে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না ঘরের সবটুকু অক্সিজেন পুড়ে যেতে। ছুটে এসে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে কুয়াশা চেষ্টা করলো মশালটা নেভানোর। লাভ হলো না। অবশেষে জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে কোমরে গুঁজলো, তার-পর জ্যাকেটটা খুলে দু'ভাঁজ করে চাপা দিলো মশালের ওপর।

এতক্ষণে ঊর্মিলার দিকে তাকানোর অবসর পেলো কুয়াশা। ভয়ে কাঠ হয়ে এতক্ষণ কুয়াশার লড়াই দেখছিলো বেচারা। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ। কুয়াশা এগিয়ে আসতেই ও ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর বুকে।

'আর ভয়ের কিছু নেই,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো কুয়াশা। 'চলো, এবার ওপাশের ঘরটা দেখি। সম্ভবত ওঘর থেকেই বেরিয়েছে দ্বিতীয় গুপ্ত সুড়ঙ্গটা।'

মণিমুক্তা মাড়িয়ে কাঠের দরজাটার দিকে এগোলো ওরা। দরজা পেরিয়ে একই আয়তনের আরেকটা কামরায় এলো দু'জন। এ কাম-রায়-ও লাল গালিচা পাতা। মাঝখানে একটা দণ্ডের ওপর আলো বিকীরণকারী পাথর বসানো। এ ঘরটাও ভরে আছে অস্পষ্ট সবুজ আলোয়। এ ঘরে কোনো ধনরত্ন দেখতে পেলো না ওরা। তিনটে কাঠের বাক্স সাজানো একপাশে। প্রাচীন ঢং-এ তামার পাত দিয়ে মোড়া কোণগুলো। দুটো বেশ বড় আকারের, একটা ছোট। তিনটে বাক্সেরই ওপরে সোনালী হরফে লেখা আর-এস। নিঃসন্দেহে ধন রত্ন নিয়ে যাওয়ার জন্যে রাজেন্দ্র সিং এনেছিলো বাক্সগুলো। পরে

কোনো কারণে পরিকল্পনা বদল করে জীবন্ত সমাহিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একটা বাক্স খুললো কুয়াশা। ফাঁকা ভেতরটা। দ্বিতীয় বাক্সটা খুললো। এটাও ফাঁকা। তৃতীয় অর্থাৎ ছোটটা খুললো এবার। মুহূর্তে যেন হেসে উঠলো ঘরটা। লাল মখমলের ওপর অত্যন্ত যত্নের সাথে বসানো রয়েছে একটা মুকুট। নিচের দিকে সোনার ওপর তিনটে সারিতে ছোট ছোট চুনী, পান্না আর নীলকান্ত মণি বসানো। ওপরে বিরাট একটা হীরা।

'গোলকুণ্ডার মুকুট!' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো ঊর্মিলা।

'হ্যাঁ, গোলকুণ্ডার মুকুট,' বললো কুয়াশা। 'কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যায় না। এতক্ষণে ওরা সুড়ঙ্গের মুখ আবার খুলে ফেললো কিনা কে জানে!'

ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলালো কুয়াশা। অস্বাভাবিক কিছুই নজরে পড়লো না। সাধারণ শাদা মর্মর পাথরের দেয়াল চারদিকে। কিংবদন্তীর সেই দ্বিতীয় গুপ্তপথের অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এই কুঠুরি থেকেই বেরিয়েছে সেটা। কিন্তু কোথায়? কি করে খোলা যাবে সে পথ? টর্চের উল্টো দিক দিয়ে দেয়ালে টোকা দিলো কুয়াশা। টুক-টুক করে শব্দ হলো—নিরেট কিছুতে টোকা দিলে যেমন হয় তেমন। আরো কয়েক জায়গায় টোকা দিলো। একই অবস্থা। এবার দ্বিতীয় অর্থাৎ দরজার উল্টো দিকের দেয়ালটা বেছে নিলো কুয়াশা। এ দেয়ালেরও পাঁচ ছ'জায়গায় টোকা দিলো ও। একই অবস্থা এ দেয়ালেও—শব্দের কোনো তারতম্য হলো না। এবার তৃতীয় দেয়াল। দ্বিতীয়বার টোকা দিতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো ওর হৃৎপিণ্ড। একটু অন্য রকম শব্দ

হলো যেন। আবার টোকা দিলো ও। একটু জোরে। হ্যাঁ, ঠিক, ফাঁপা কিছুর ওপর টোকা দিলে যেমন শব্দ হয় তেমন।

ফাঁপা জায়গাটার লম্বা-চওড়া বের করতে ত্রিশ সেকেণ্ড লাগলো। তিন ফুট মতো চওড়া, আর ছ'ফুট লম্বা—অর্থাৎ একটা দরজার সমান। এখান দিয়েই বেরিয়েছে গুপ্তপথ। কিন্তু খোলা যাবে কি করে ওটা? কোনো কূল কিনারা পেলো না কুয়াশা। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। পকেট থেকে মিনি আলট্রাসোনিক বক্সটা বের করলো ও। লাল বোতামটা একটু টেনে টিপে ধরলো শাদা বোতাম। হাঁ করে তাকিয়ে দেখলো উর্মিলা, সরু একটা দাগ সৃষ্টি হয়েছে দেয়ালের গায়ে। ধীরে ধীরে বাক্স ধরা হাতটা সরিয়ে আনছে কুয়াশা, একটু একটু করে লম্বা হচ্ছে দাগ। দেয়ালের একেবারে নিচে আড়াআড়ি তিন ফুট লম্বা একটা দাগ টানলো কুয়াশা। তারপর লম্বালম্বি ছ'ফুটি দুটো। সব শেষে দুটো ছ'ফুটি দাগের মাথাকে আরেকটা তিনফুটি দাগ দিয়ে জুড়ে দিলো।

মিনি আলট্রাসোনিক বক্স-এর শাদা বোতামটা ছেড়ে দিলো কুয়াশা। লাল বোতামটা বসিয়ে দিলো জায়গামতো। তারপর এক পাশে সরে এসে আস্তে ঠেলা দিলো তিন ফুট বাই ছ'ফুট আয়ত-ক্ষেত্রটার ওপর দিকে। ঘড়-ঘড়-ঘটাং! প্রচণ্ড একটা শব্দে কানে তালা ধরে গেল উর্মিলার। সেই সাথে অবাক বিস্ময়ে দেখলো ছ'-ফুট বাই তিন ফুট একটা পথ তৈরি হয়েছে দেয়ালের গায়ে। অন্ধ-কার একটা সুড়ঙ্গ এগিয়ে গেছে সেখান দিয়ে। টর্চ জ্বেলে সুড়ঙ্গে আলো ফেললো কুয়াশা। যতদূর দেখতে পেলো, সোজা এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

আলট্রাসোনিক বক্সটা পকেটে রেখে উর্মিলার কাছে এসে দাঁড়া-

লো কুয়াশা।

'আর চিন্তা নেই, এই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যাবো আমরা।'

'চলো!' ব্যস্তগলায় বললো উর্মিলা।

'ধনরত্নগুলো না নিয়েই!'

এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো উর্মিলার।

'তাই তো! কিন্তু আমরা মাত্র দু'জন, অত জিনিস নেবো কি করে?'

'এই বাক্সে ভরে,' বলতে বলতে বড় বাক্সদুটো তুলে নিলো কুয়াশা। ছোটটার দিকে ইশারা করে বললো, 'তুমি নিয়ে এসো ওটা।'

বাক্স তিনটে নিয়ে আগের কামরায় ফিরে এলো ওরা। ঝটপট বড় দুটো বাক্স ভরে ফেললো হীরা, চুনী, পান্না আর পদ্মরাগ. নীলকান্ত মণি দিয়ে। বেশির ভাগই এঁটে গেল এ দুটোতে। বাকি যেটুকু আছে আশা করা যায় ছোট বাক্সে এঁটে যাবে সব। ছোট বাক্সটা খুললো কুয়াশা। মুকুটটা আলগোছে নামিয়ে রাখলো গালিচার ওপর। তারপর আঁজলা ভর্তি রত্ন তুলে রাখতে লাগলো বাক্সে। যা ভেবেছিলো তা-ই, শেষ রত্নটাও এঁটে গেল ওতে। উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। মুকুটটা পরিয়ে দিলো উর্মিলার মাথায়।

'চলো, আর এক মুহূর্ত-ও এখানে নয়। ছোট বাক্সটা নিতে পারবে না তুমি?'

বাক্সটা তুললো উর্মিলা। মুখটা একটু বিকৃত হয়ে গেল। সম্ভবত বাক্সটার ওজনেই।

'পারবো,' বললো ও। 'জান বেরিয়ে যাবে যদিও, তবু পারবো।'

'তাহলে চলো। টর্চটা তোমার কাছে রাখো তুমি আগে আগে

এগোবে।'

বড় বাক্সদুটোর একেকটার ওজন হবে কমপক্ষে দু'মণ করে। অবলীলা ক্রমে দুটো বাক্স দু'হাতে তুলে নিলো কুয়াশা। এগোলো উর্মিলার পেছন পেছন।

আরো পাঁচ মিনিট কাটলো। অস্থিরতার ছাপ এবার মুখেও স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে লিন-এর। হঠাৎ কি মনে হতেই পা পা করে এগিয়ে গেল সে রাজা সুরেন্দ্র সিং-এর মমি রাখা চারকোণা গর্তের সামনে। হাত ঢুকিয়ে দিলো ভেতরে। আস্তে আস্তে হাতড়ে চললো গর্তের গা। ওপরটা দেখলো। কিছু ঠেকলো না হাতে। সুরেন্দ্র সিং-এর বাঁ পাশ দিয়ে এবার হাত ঢোকালো সে। একই অবস্থা। তারপর ডান পাশ। ওপর থেকে ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে আনছে সে। হঠাৎ একটা আংটা মতো ঠেকলো হাতে। খপ করে ধরলো সে আংটাটা। টান দিলো সর্বশক্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক টান অনুভব করলো হাতে। হাতের সাথে সাথে তার শরীরটাও এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। সময় মতো আংটাটা ছেড়ে দেয়ায় মাথাটা বাড়ি খেলো না দেয়ালের সাথে। হাত বের করে এনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো লিন। রাজা সুরেন্দ্র সিং-এর দেহ সহ শবাধারটা অদৃশ্য হয়েছে। গুপ্ত পথটা খুলে গেছে আবার। লিন-এর আশপাশে দাঁড়ানো ডাকাতরা চিৎকার করে উঠলো বন্য উল্লাসে।

এখনও উল্টো দিকের দেয়াল হাতড়ে চলেছে ফ্যারেল। তার-দিকে ফিরলো লিন।

'হয়েছে, মিস্টার ফ্যারেল, আর খুঁজতে হবে না তোমাকে!' বলেই কাছে দাঁড়ানো এক ডাকাতের হাত থেকে একটা মশাল

নিয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো সে। তার পেছন পেছন পিল পিল করে ঢুকতে লাগলো ঠগীরা।

কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ওপাশের কামরায় পৌঁছুলো লিন। হ্যাগার্ডের লাশের ওপর পড়ে থাকা ডাকাতটা তখন সবে মাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

'আপনি এসেছেন, দেবতা!' হাউমাউ করে উঠলো সে।

'কি ব্যাপার, তোমাদের এ অবস্থা কেন? মেয়েটা আর ঐ লোকটা কোথায়?'

'জানি না, দেবতা! ওখানে ধনরত্নের স্তূপ দেখে সব ভুলে ছুটে এসেছিলাম আমরা—,' যেখানে রত্নের স্তূপ দেখেছিলো সেদিকে তাকালো লোকটা। পরমুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠলো। 'হায় হায়, দেবতা, কোথায় গেল ওগুলো!'

মুহূর্তে বুঝে ফেললো লিন যা বোঝার। ওপাশের কাঠের দরজাটার দিকে তাকালো। সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে আসা ডাকাতদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা এখানেই থাকো। আর কেউ এক জন যাও, মিস্টার ফ্যারেলকে আসতে বলো এখানে।'

দরজা পেরিয়ে পাশের কামরায় ঢুকলো লিন। প্রথমেই চোখ পড়লো দেয়ালের গায়ে তিনফুট বাই ছ'ফুট গহ্বরটার ওপর। দাঁতে দাঁত ঘষলো লিন। এই সময় তার পাশে এসে দাঁড়ালো ফ্যারেল।

'তোমার জন্যে, মিস্টার ফ্যারেল,' খেঁকিয়ে উঠলো লিন। 'তোমার জন্যেই ওরা পালাতে পারলো। পঁই পঁই করে বলে দিয়েছিলাম, সব সময় ওদের কাছাকাছি থাকবে—কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। এখন যাও, এই সুড়ঙ্গ ধরে পালিয়েছে ওরা, পেছন পেছন গিয়ে ধরো। ওদের সাথে যে বোঝা

আছে—বেশি দূর যেতে পারেনি সম্ভবত। আমি ওপর দিয়ে যাচ্ছি—ওপরে উঠতে হবে ওদের। তুমি যদি এবারও ব্যর্থ হও, আমি নিজে ধরবো ওদের।'

বাছাই করা দশজন ঠ্যাঙাড়ে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো ফ্যারেল। মশালের লাল আলোয় ওদের ঘর্মাক্ত মুখগুলো জান্তব লাগছে। প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে চোখে।

বারো

বাক্সটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো উর্মিলা।

'আর পারছি না, কুয়াশা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ও। 'চলো এমনিই চলে যাই আমরা, দরকার নেই এত ধনরত্নের!'

অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে হৈ-চৈ-এর আওয়াজ। লিন-এর লোকজন ঢুকে পড়েছে সুড়ঙ্গে। যদিও এখনো বেশ দূরে কিন্তু বুঝতে পারছে কুয়াশা, ওরা এগিয়ে আসছে—নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে। এতটা করে ওজন বইতে হচ্ছে না ওদের, অনেক দ্রুত এসে পড়তে পারবে ওরা। কিন্তু তাই বলে এত পরিশ্রম করে পাওয়া রত্নগুলো রেখে যাবে? অসম্ভব! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

গত দশ মিনিট একটানা হেঁটে এসেছে ওরা। হাতে এতটা করে ওজন নিয়ে যতখানি দ্রুত সম্ভব ততখানিই দ্রুত হেঁটে এসেছে ওরা। কুয়াশা আরো কিছুক্ষণ পারবে এ গতি বজায় রেখে হেঁটে যেতে, কিন্তু উর্মিলা আর পারছে না।

'আর একটু, উর্মিলা!' বললো কুয়াশা। 'আর কয়েক মিনিট। অনেক দূর এসে পড়েছি আমরা, খুব শিগগিরই শেষ হবে সুড়ঙ্গ।'

'কি করে জানো তুমি, শিগগিরই শেষ হবে?'

'আনন্দ রায়ের কথা মনে নেই? আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলো তখন তৈরি করা হয়েছিলো সুড়ঙ্গ-টা, মানে পালানোর জন্যেই। নিশ্চয়ই এই সুড়ঙ্গ পথে কয়েকশো মাইল যাওয়ার কথা ভাবেনি তখনকার রাজা। পুরনো শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে এই সুড়ঙ্গ। আর আমার হিসেব বলছে, পুরনো শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি আমরা। সুতরাং আর বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়।'

শুনে একটু আশ্বস্ত হলো যেন উর্মিলা। আবার তুলে নিলো বাক্সটা।

আরো কাছে এসে গেছে হৈ-চৈ-এর আওয়াজ। এবার কুয়াশাও একটু শঙ্কিত বোধ করছে মনে মনে। সত্যি সত্যিই কি শহরের বাইরে-ই শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গ? না আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছে? এমন সময় নিরেট একটা দেয়ালের ওপর পড়লো টর্চের আলো। ধক করে উঠলো উর্মিলার বুকের ভেতর।

'সুড়ঙ্গ শেষ, কুয়াশা!'

সামনে উর্মিলা থাকায় কুয়াশা দেখতে পায়নি দেয়ালটা। একটু উদ্বিগ্ন গলায় বললো, 'কই দেখি?'

এক পাশে, সরু সুড়ঙ্গের ভেতর যতখানি সরে দাঁড়ানো যায়, সরে দাঁড়ালো ঊর্মিলা। বাক্স দুটো নামিয়ে রেখে ওর কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে এগিয়ে গেল কুয়াশা। একটু পরেই পরম স্বস্তি নিয়ে ও দেখলো, শেষ হয়ে যায়নি সুড়ঙ্গ, তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়েছে শুধু। আগেও বেশ কয়েকবার বাঁক নিয়েছে সুড়ঙ্গ কিন্তু সেগুলোর একটাও এমন তীক্ষ্ণ নয়।

তাড়াতাড়ি ফিরে এলো কুয়াশা। টর্চটা আবার ঊর্মিলার হাতে দিয়ে তুলে নিলো বাক্স দুটো।

'শেষ হয়ে যায়নি, ওখানে একটা বাঁক নিয়েছে সুড়ঙ্গ। তাড়াতাড়ি এগোও, এসে পড়লো ওরা!'

মোড় নিয়ে মাত্র দশ পনের পা যেতে পারলো তারপরই বন্ধ একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। সুড়ঙ্গ যতখানি চওড়া আর উঁচু, দরজাটাও ততখানিই চওড়া আর উঁচু। বিরাট ভারি একটা লোহার ছিটকিনি লাগানো কপাটের মাঝামাঝি জায়গায়। বাক্স দুটো নামিয়ে রেখে ছিটকিনিটা খোলার চেষ্টা করলো কুয়াশা। পারলো না। কয়েক শতাব্দী আগে আটকানো ছিটকিনি জং ধরে শক্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বার চেষ্টা করার কথা ভুলেও ভাবলো না ও—আরো এগিয়ে এসেছে পেছনের কোলাহল, ওর ধারণা আর আধ মিনিটের ভেতর এখানে পৌঁছে যাবে তাড়া করে আসা লোকগুলো। দ্রুতহাতে পকেট থেকে মিনি আলট্রাসোনিক বক্সটা বের করলো ও। ঠিক সাত সেকেণ্ডের মাথায় খুলে গেল দরজা। বড়সড় একটা কামরায় ঢুকলো ওরা।

প্রথমেই দরজার উল্টো পাশটা পরীক্ষা করলো কুয়াশা। হ্যাঁ, এ পাশেও আছে ছিটকিনি। তাড়াতাড়ি ও বাক্স তিনটে ভেতরে নিয়ে

এসে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি টেনে দিলো। টর্চ নিভিয়ে দিতেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নেমে এলো ঘরে। তবু গভীর স্বস্তির একটা নিশ্বাস ছাড়লো উর্মিলা।

'যাক বাবা, বাঁচা গেছে। আর ওরা তাড়া করে আসতে পারবে না!'

'হ্যাঁ, আপাতত।' মুখে বললো বটে, কিন্তু মনে মনে কুয়াশা জানে, একটুও নিরাপদ নয় ওরা। দরজাটা কাঠের। লিনের লোকদের খুব বেশি হলে দশ মিনিট লাগবে ওটা ভাঙতে। সুতরাং সময় নষ্ট করা যাবে না। টর্চ জ্বেলে ঘরটার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ও।

বিশ ফুট বাই বিশ ফুট হবে কামরার আয়তন। ছাদ প্রায় পনের ফুট উঁচু। কামরার মাঝামাঝি জায়গায় প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি, ছাদ ফুঁড়ে ওপর দিকে উঠে গেছে।

'দাঁড়াও তুমি!' বলেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল কুয়াশা। একেকবারে দুটো করে ধাপ টপকালো। আর মাত্র আট কি দশটা ধাপ বাকি, এমন সময় ওর মাথা ঠেকে গেল উপরে। তার মানে বেরোনোর মুখ বন্ধ। হতাশ হলো না কুয়াশা, এ রকমই আশা করেছিলো ও। টর্চের মুখ ঘুরিয়ে মাথার ওপর আলো ফেলতে দেখলো লোহার একটা ঢাকনা লাগানো। ঢাকনার ফুট খানেক নিচে একটা ব্রোঞ্জের হাতল।

টর্চটা বাঁ হাতে নিলো কুয়াশা, ডান হাতে ধরলো হাতল। সর্বশক্তিতে টান দিলো নিচের দিকে। কিন্তু এক চুল নড়লো না ওটা। এবার ওপর দিকে ঠেলা দিলো ও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল হাতলটা। ঘড় ঘড়ে একটা আওয়াজ উঠলো মাথার কাছে। এক

সেকেণ্ড পরেই দেখলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ওপরে লোহার ছাদটা। আরো এক সেকেণ্ড পর নির্মেঘ আকাশ দেখতে পেলো কুয়াশা। ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে বাইরে। নিরব নিথর চারদিক।

সিঁড়ির আরো কয়েক ধাপ ওপরে উঠলো ও। বুক পর্যন্ত বেরিয়ে এলো বাইরে। সামনে পাহাড়ী একটা উপত্যকা। ডানে কিছু দূরে খাড়া উঠে গেছে একটা পাহাড়, বাঁয়ে পাহাড়ী সমভূমি। পেছন ফিরে তাকালো ও। দূরে দেখতে পেলো ফালির পুরনো শহরের শিবমন্দিরের চূড়া। জীবিত কোনো কিছুর ছায়া-ও দেখতে পেলো না চারপাশে। কিন্তু একটু সতর্কভাবে লক্ষ্য করলেই ও দেখতে পেতো, ডানের খাড়া পাহাড়টার নিচু একটা চূড়ার আড়ালে চোখে ফিল্ড গ্লাস লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিন। তার পেছনে ভোজালি হাতে অপেক্ষা করছে তিনজন ভয়ঙ্করদর্শন ঠগী।

সিঁড়ির ওপর বসে পড়লো কুয়াশা। এখন ওর মাথাটা কেবল বেরিয়ে আছে গর্তের বাইরে। দ্রুতহাতে ডান পায়ের জুতোটা খুলে ফেলে খসিয়ে আনলো গোড়ালী। এবার হাত থেকে ঘড়িটা খুললো। ঘড়ির উল্টোদিক থেকে খসিয়ে আনলো চকচকে একটা চাকতি। এক পাশ অসমতল ওটার, অনেকটা রেডিও টেলিস্কোপের অ্যান্টেনার মতো। জুতোর গোড়ালীর ওপর দিকে একটা ক্লিপের সাথে চাকতিটা আটকে দিলো ও। তারপর ছোট্ট একটা বোতাম টিপতেই মৃদু কির কির শব্দ শোনা গেল। নীল রঙের ছোট্ট একটা বাতি জ্বলে উঠলো হিলের ভেতর। অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কুয়াশার ছোট্ট অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটারে :

'ইয়েস, বস !'

অত্যন্ত সংক্ষেপে অবস্থান জানিয়ে ট্রান্সমিটার অফ করে দিলো কুয়াশা। চকচকে চাকতিটা ঘড়ির নিচে জায়গামতো বসিয়ে, জুতোয় গোড়ালী লাগিয়ে পরে নিলো জুতোটা। দশ সেকেণ্ড পর নিচে নেমে এলো ও। দেখলো সিঁড়ির গোড়ায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উর্মিলা। ধুপধাপ ধাক্কা পড়ছে বন্ধ দরজার ওপর। প্রতিবার ধাক্কার সাথে কেঁপে কেঁপে উঠছে দরজা। ভাঙতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে? ডাকাতদের হিংস্র চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। দরজাটা বেশ পুরু, সে কারণে চিৎকারের আওয়াজ খুব একটা ঢুকতে পারছে না। তবু যেটুকু ঢুকছে সেটুকুই উর্মিলার পিলে চমকে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। উর্মিলার কাঁধে হাত রেখে ওকে একটু আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো কুয়াশা।

'চিন্তা করো না, মজবুত আছে দরজাটা, ভাঙতে পারবে না ওরা। যদিও পারেও যতক্ষণে পারবে ততক্ষণে আরো দূরে চলে যাবো আমরা।'

কুয়াশার আশ্বাসে খুব একটা আশ্বস্ত হলো না উর্মিলা।

'যেভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে দরজাটা···' হঠাৎ কুয়াশার একটা হাত জড়িয়ে ধরলো ও। 'আমাকে ক্ষমা করে দাও, কুয়াশা। আমার জন্যেই আজ তোমার এ অবস্থা। তোমার নিষেধ না শুনে কি ভুল করেছি তা এখন হাড়ে হাড়ে···।'

'হয়েছে, আর একটা কথাও না' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো কুয়াশা। 'মুখে যা-ই বলে থাকি না কেন, আমার ষোল আনা ইচ্ছে ছিলো এখানে আসার। তোমার নিজের অপরাধটা না ভাবলেও চলবে। চলো, এবার উঠে পড়ি আমরা, বাক্সটা নিয়ে এসো। পারবে তো উঠতে?'

ঘাড় কাত করলো উর্মিলা।

বড় বাক্সদুটো দু'হাতে নিয়ে উঠতে শুরু করলো কুয়াশা, পেছন পেছন উর্মিলা। টর্চ-এর আর কোনো দরকার নেই এখন, ওপরের খোলা মুখ দিয়ে যে আলো আসছে তাতেই পুরো সিঁড়ি আলোকিত হয়ে উঠেছে।

খাড়া উঠে গেছে পাহাড়টা। খুব কাছাকাছি উঁচু নিচু অনেকগুলো চূড়া। সবচেয়ে নিচু চূড়াটার উচ্চতা হবে দেড়শো ফুট, আর সবচেয়ে উঁচুটা দেড় হাজার। নিচু চূড়াটার ঠিক ওপরে প্রায় মানুষ সমান উঁচু একটা পাথরের চাঁই। তার এপাশে দাঁড়িয়ে আছে লিন। পেছনে ভয়ঙ্করদর্শন তিন ডাকাত। চোখে ফিল্ড গ্লাস লাগিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে লিন নজর রাখছে সামনের উপত্যকার ওপর। তার ধারণা এই উপত্যকারই কোথাও আছে ফালির রাজাদের সমাধি-মন্দির থেকে বেরোনো গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখ। ঐ মুখ দিয়েই গুপ্তধনসহ বেরিয়ে আসবে রাজেন্দ্র সিং-এর মেয়ে আর সেই লোকটা।

অন্য জায়গায়ও যে থাকতে পারে সুড়ঙ্গের মুখ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন লিন। তাই সমাধি মন্দির থেকে উঠে এসেই বাইরে যে কজন ঠ্যাঙাড়েকে পেয়েছে, সবাইকে তিন চারজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পাঠিয়ে দিয়েছে ফালির পুরনো শহরের চারপাশে বিভিন্ন জায়গায়, নজর রাখার জন্যে। নিজের সঙ্গে রেখেছে মাত্র তিনজনকে। মেয়েটাকে সে হিসেবেই ধরে না, আর লোকটাকে শায়েস্তা করার জন্যে নিজেকেই যথেষ্ট মনে করে। তবু সাবধানতা হিসেবে তিন জনকে সঙ্গে রেখেছে। খোলা ভোজালি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন।

হঠাৎ ক্রুর একটা হাসি ফুটে উঠলো লিন-এর ঠোঁটে। সামনের ফাঁকা উপত্যকার এক জায়গায় নড়ে উঠেছে মাটি। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখলো একটা গর্ত মতো তৈরি হয়েছে সেখানে। আরো কয়েক সেকেণ্ড পর দেখলো একটা মাথা বেরিয়ে এসেছে গর্তের বাইরে। শক্তিশালী ফিল্ড গ্লাসের লেন্সের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চেহারাটা। রাজেন্দ্র সিং-এর মেয়ের সাথে এই লোককেই দেখেছিলো সে।

গর্তের মুখে দু'তিন সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলো লোকটা। চারপাশে চোখ বুলালো একবার। তারপরই নিচে নেমে গেল লোকটার শরীর। এখন শুধু মাথাটা বেরিয়ে আছে গর্তের বাইরে। কয়েক সেকেণ্ড পর সেটাও ঢুকে গেল গর্তের ভেতর।

আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। ফিল্ড গ্লাসটা গলায় ঝুলিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসতে লাগলো লিন।

সিঁড়ির প্রায় মাথায় উঠে এসেছে ওরা। আর কয়েকটা মাত্র ধাপ। গর্তের কিনারার সোজাসুজি এখন কুয়াশার মাথা। আরেকটা ধাপ উঠলো ও। মাথাটা বেরিয়ে এলো বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল ওর শরীর। ট্রাউজার পরা দুটো পা দেখা যাচ্ছে। গর্তের কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক।

ধীরে ধীরে মুখ উঁচু করলো কুয়াশা। লিন-এর ভাবলেশহীন মুখটা দেখতে পেলো। কয়েক পা পেছনে তিন ঠ্যাঙাড়ে। অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠলো লিন-এর মুখে।

'সময় মতোই এসে পড়েছো তাহলে, মিস্টার লিন?'

'সময় মতো এসে পড়াটাই আমার স্বভাব।'

'বেশ বেশ। তা, আমরা এখন উঠবো, না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো?'

'উঠে এসো।'

শেষ ধাপ টপকে ওপরে উঠে এলো কুয়াশা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই উর্মিলা। গোলকুণ্ডার মহামূল্যবান মুকুটটা এখনো রয়েছে ওর মাথায়। ভোরের সূর্যের আলো পড়লো মুকুটের রত্নগুলোর ওপর। ঝকমক করে ঠিকরে পড়লো নানা বর্ণের আলোক রশ্মি। ওপরের বড় হীরক খণ্ডটা থেকে শত ধারায় ছিটকে পড়ছে, লাল, নীল, বেগুনী, সবুজ, হলুদ আলোর রেখা। চোখ ধাঁধিয়ে গেল লিন-এর। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো সে উর্মিলার মাথা থেকে মুকুটটা নেয়ার জন্যে।

এই সুযোগটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলো কুয়াশা। ঝট করে উর্মিলার মাথা থেকে মুকুটটা নিয়ে ছুঁড়ে দিলো লিন-এর পেছনে ডাকাত তিনটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুকুটটার ওপর লাফিয়ে পড়লো তিন ঠগী। হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠলো লিন-এর দু'চোখ। বাঘের মতো লাফ দিয়ে কুয়াশার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরেও। দ্রুত এক-পাশে সরে এসে পা চালালো ও। ঘুসি বাগিয়ে লাফ দিয়েছিলো লিন, কুয়াশা সরে যাওয়ায় ফস্কে গেল ঘুসিটা। ক্ষণিকের জন্যে তাল হারালো সে। ঠিক সেই সময় কুয়াশার লাথিটা এসে লাগলো তার বুকের পাশে। কোঁক করে একটা শব্দ বেরোলো লিন-এর গলা দিয়ে তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে দাঁড়ালো। বুঝে ফেলেছে হাতাহাতি লড়াই-এ অত্যন্ত দক্ষ প্রতিপক্ষ। এবার সাবধান হলো সে। মুষ্টিযোদ্ধার

ভঙ্গিতে ঘুসি বাগিয়ে দাঁড়ালো। দু'হাত দু'পাশে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। লিন-এর চোখের দিকে ওর চোখ। পা পা করে এগিয়ে আসছে লিন, সম্পূর্ণ সতর্ক। আচমকা ঘুসি মারার ভঙ্গি করেই পা চালালো সে। এমন কিছু যে করতে পারে লিন তা যেন জানাই ছিলো কুয়াশার। হাত দুটো উঁচু করে খপ করে ধরে ফেললো লিন-এর একটা পা। প্রচণ্ড একটা মোচড় দিয়ে ঠেলে দিলো পেছন দিকে। কট করে একটা শব্দ হলো। হাঁটুর কাছের হাড়টা বোধহয় ছুটে গেল লিন-এর। দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। তীব্র একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এসেছে ওর গলা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো লিন, কিন্তু পারলো না ভাঙা হাঁটু নিয়ে। এদিকে ডাকাত তিনটে দেবতাকে পড়ে থাকতে দেখে সেই রক্ত হিম করা স্বরে চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুকুটটা পড়ে আছে মাটিতে। তিন-জনের হাতেই খোলা ভোজালি। গায়ে গা ঠেকিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে তারা। কুয়াশা তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

'কুয়াশা, পেছনে!' হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ঊর্মিলা।

ঝট করে পেছন ফিরলো কুয়াশা। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো ও। টাশ করে শব্দ হলো। কুয়াশার চুল ছুঁয়ে চলে গেল লিন-এর পিস্তলের গুলি। কুয়াশা যেখানে পড়েছে এখন সেদিকে পিস্তল তাক করছে লিন। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেয়েছে কুয়াশা। দ্বিতীয় গুলিটাও চলে গেল ওর পাশ দিয়ে। দ্বিতীয় আরেকটা ডিগবাজি খেয়ে লিন-এর

পেছনে চলে এলো কুয়াশা। অতি কষ্টে শরীর মুচড়ে কুয়াশার দিকে ফেরার চেষ্টা করছে লিন। কিন্তু ততক্ষণে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে কুয়াশা। একটু ঝুঁকে অবলীলায় তুলে নিলো দশাসই মঙ্গোলিয়ানটাকে। ওয়েট লিফটিং-এর ভঙ্গিতে উঠিয়ে ফেললো মাথার ওপর।

এদিকে ডাকাত তিনজন এসে পড়েছে কাছে। ভোজালি বাগিয়ে ধরা তাদের বুকের সোজাসুজি। আর তিন পা এসেই বসিয়ে দেবে কুয়াশার বুকে। শূন্যে তোলা লিন-এর দেহটা আস্তে ছুঁড়ে দিলো কুয়াশা তিন ঠ্যাঙাড়ের দিকে। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তিনটে আওয়াজ হলো। পরমুহূর্তে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তীব্র এক আর্তচিৎকার। এক সাথে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ডাকাত তিনটে। তাদের ওপরে পড়লো লিন-এর প্রাণহীন দেহটা। গলা, পেট, আর উরুতে ভোজালি গেঁথে গেছে বেচারার।

ভয়ার্ত একটা আর্তনাদ করে মুখ ঢেকেছে ঊর্মিলা-ও। ওর পাশে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। এমন সময় অস্পষ্ট একটা যান্ত্রিক কট কট আওয়াজ ভেসে এলো দূর থেকে। হাসি ফুটে উঠলো কুয়াশার মুখে। ঊর্মিলার মাথায় হাত রাখলো ও।

'আর কোনো চিন্তা নেই, ঊর্মিলা। আর কয়েক মিনিটের ভেতর এখান থেকে চলে যাবো আমরা।'

মুখ তুলে তাকালো ঊর্মিলা।

'কি করে? এই ভারি বাক্স নিয়ে আর এক পা-ও চলতে পারবো না আমি। আশেপাশে নিশ্চয়ই আরো ডাকাত আছে, ওরা ধরে ফেলবে আমাদের!'

ঊর্মিলাকে অপূর্ব একটা হাসি উপহার দিলো কুয়াশা।

'না পারবে না—।'

লিন-এর লাশের তল থেকে বেরিয়ে এসেছে ডাকাত তিনটে। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে কুয়াশার দিকে। আর পা পা করে এগোচ্ছে মাটিতে পড়ে থাকা মুকুটটার দিকে। কোমরে গুঁজে রাখা কুমার সিং-এর পিস্তলটা এবার বের করলো কুয়াশা। মাথার ওপর তুলে গুলি করলো একবার। তারপর হিন্দীতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভাগো এখান থেকে!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তিন ঠগী। পিস্তলটা ওদের দিকে তাক করলো কুয়াশা। কটমট করে তাকালো। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো ডাকাত তিনটে। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে দেখলো একবার কুয়াশাকে। তারপর ঝেড়ে দৌড় পাহাড়ের দিকে।

যান্ত্রিক আওয়াজটা এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বিস্মিত চোখে কুয়াশার দিকে তাকালো ঊর্মিলা।

'ও কি!?'

কোনো জবাব দিলো না কুয়াশা। মৃদু একটু হাসলো শুধু। একটু পরেই আকাশে দেখা গেল হেলিকপ্টারটা। সোজা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এমন সময় সমবেত কণ্ঠে তীব্র একটা উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল নিচের গুহায়। আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল ঊর্মিলার মুখ।

'ওরা ভেঙে ফেলেছে দরজা!'

কিছু বললো না কুয়াশা। বড় বাক্স দুটো তুলে নিয়ে রেখে এলো গজ দশেক দূরে। ছুটে গিয়ে মাটি থেকে তুলে নিলো মুকুটটা। মাথার ওপর চলে এসেছে হেলিকপ্টার। নেমে আসছে ধীরে ধীরে। ওপর দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল মাটির দিকে ঝাঁকিয়ে

একটা ইশারা করলো কুয়াশা। তারপর দৌড়ে চলে এলো উর্মিলার কাছে। মুকুটটা পরিয়ে দিলো গোলকুণ্ডার রাজকুমারীর মাথায়। এক হাতে ছোট বাক্সটা তুলে নিয়ে পিস্তল ধরা হাতে ধরলো উর্মিলার হাত। তারপর ছুটলো বড় বাক্সদুটো যেখানে রেখে এসেছে সেদিকে। হেলিকপ্টারটা ওখানেই নামছে।

বড় বাক্স দুটোর কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। আর খুব বেশি হলে ত্রিশ ফুট ওপরে রয়েছে হেলিকপ্টার। রোটরের ঠেলে দেয়া তীব্র বাতাসে উড়ছে ওদের চুল, গায়ের কাপড়। উর্মিলার মাথা থেকে মুকুটটা উড়ে চলে যেতে চাইলো একবার। ঝট করে মাথায় হাত দিয়ে ঠেকালো ও।

একবার কপ্টারের দিকে একবার সুড়ঙ্গের মুখের দিকে তাকাচ্ছে কুয়াশা। কপ্টারের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বুনো কোলাহল। হঠাৎ একটা মাথা দেখতে পেলো ও গর্তের মুখে। শাদা একটা মুখ। তারপর পুরো শরীর। জুয়াড়ী উইলিয়াম ফ্যারেল। হাতে রিভলবার।

গর্তের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারেল বুঝে ফেললো পরিস্থিতি। রিভলবার তুললো কুয়াশাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই পিস্তল তাক করেছে কুয়াশা। ফ্যারেল ট্রিগার টানার আগেই ওর বুলেট গিয়ে আশ্রয় নিলো তার বুকে। তিন সেকেণ্ড পর মাটি স্পর্শ করলো হেলিকপ্টার।

দরজা খুলে নেমে এলো মিস্টার স্যানন ডি কস্টা। হাতে একটা সাবমেশিন গান। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। ঝটপট বাক্স তিনটে কপ্টারে উঠিয়ে ফেললো কুয়াশা। মিস্টার ডি কস্টা উর্মিলাকে সাহায্য করলো উঠতে। তারপর ঝট করে মেশিনগানের

নল তাক করলো সুড়ঙ্গের মুখটার দিকে। পিল পিল করে ঠগী ডাকাত বেরিয়ে আসছে সেখান দিয়ে।

'থাক, মিস্টার ডি কস্টা, মাফ করে দিন ওদের। এমনিতেই বেচারারা গুপ্তধন হারিয়েছে, প্রভুকেও খুইয়েছে। এর ভেতরে আরো কয়েকজনকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে খামোকা ওদের মনঃকষ্টের কারণ কেন হন? তারচেয়ে চলুন, আমরা উঠে পড়ি কপ্টারে।'

দু'সেকেণ্ড পর মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলো কপ্টার। ধেয়ে চললো পুব দিকে।

—ঃ শেষ ঃ—

একখণ্ডে সমাপ্ত

কুয়াশা-৭৬

গুপ্তধন

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিশেষ আমন্ত্রণে
আন্তর্জাতিক এক বিজ্ঞান সম্মেলনে
যোগ দিতে লণ্ডনে গিয়েছিল কুয়াশা।
দেশে ফিরে আসছে জাহাজে করে—
বিশ্রাম দরকার ওর,
লম্বা কিছুটা সময় দরকার ভাবনা চিন্তার জন্যে।

ছোট্ট একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে
জাহাজেই পরিচয় হলো ফালির রাজকন্যা
উর্মিলার সাথে।
গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছে মেয়েটা।
কিন্তু পেছনে লেগেছে ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল
উইলিয়াম ফ্যারেল, হ্যাগার্ড, লিন।

কুয়াশার সাহায্য চেয়ে বসলো উর্মিলা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

আঠারো টাকা মাত্র